ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পুরাকালে পরশুরাম এসেছিলেন মানুষ মারতে, আমাদের কালে পরশুরামের সে রকম কোন মারাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষকে হাসিয়ে গিয়েছেন। এই হাসির প্রকৃতি কি তা না-হয় পরে বিচার করা যাবে, তবে আপাততঃ নির্বিচারে বলা যায় যে পরশুরাম হাসির গল্প লিখে গিয়েছেন,—সে সব গল্পে অন্য উপাদান থাকলেও, হাসিটাই মূল উপাদান। হাসির গল্পলেখক মাত্রেই হাসিখুশি থাকবে, আমাদে হবে এরকম ধারণা অনেকের আছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে হাসির রচনা যাঁরা লিখে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, পরশুরাম সকলেরই প্রকৃতি গম্ভীর। প্রাচীনদের মধ্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, কারণ তাঁদের দু'জনেরই দুঃখের জীবন। এত দুঃখের মধ্যে এত হাসিকে কেমন করে তাঁরা রক্ষা করেছেন সে এক বিস্ময়। শমীবৃক্ষ আপন অভ্যন্তরে অগ্নিকে কিভাবে রক্ষা করে? ব্যতিক্রম বোধ করি দীনবন্ধু। দীনবন্ধু আমোদপ্রিয় মজলিসী ব্যক্তি ছিলেন। আবার তিনিও ব্যতিক্রম কিনা সন্দেহ করবার কারণ আছে, যেহেতু খুব সম্ভব একই সঙ্গে দুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বকে অন্তরে তিনি পোষণ করতেন। একজন সামাজিক ব্যক্তি, অপরজন সাহিত্যিক। তবু না হয় স্বীকার করা গেল তিনি ব্যতিক্রম।

প্রকৃত হাস্যরসের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে, প্রকৃত হাস্যরস আর যাই হোক তরল নয়। কালিদাস যে কৈলাস পর্বতকে ত্র্যম্বকের অট্টহাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন সে এই জন্যে। প্রকৃত হাস্যরস করুণার রূপান্তর বলেই তা গহন গম্ভীর। এ কথাই সবাই বোঝে না বোলেই হাসির গল্পের লেখককে দেখতে গিয়ে আমুদে লোককে প্রত্যাশা করে। পরশুরামকে দেখতে গিয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছে এ কেমন ধারা হলো, ইনি যে গম্ভীর রাশভারী লোক।

অনুরূপা দেবীর এইরকম আশাভঙ্গ হয়েছিল। "আমার বিশ্বাস ছিল 'পরশুরাম' আমার পরম স্নেহাস্পদ 'বিশু'র স্বামী, তাঁর লেখার মতই খুব হাসিখুশিতে ভরা অত্যন্ত সামাজিক, চালাক, চটপটে একটি আমুদে লোক হবেন। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে মনে ভাবলাম —ইনি কি করে ওই সব অপূর্ব হাস্যরসের আধার হলেন? এ যেন 'সরষার মধ্যে তাল'। মজফরপুর থাকতে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার স্বামীর সহপাঠী সাবজজ ব্রজেন ঘোষের স্ত্রী পঙ্কজিনী ঘোষের মারফত তাঁর ছোট বোন (কনিষ্ঠা নয়) বিশুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তার পত্রে। তার স্বামীর কথা, তাঁর আঁকা বিশুরই চিত্র (অসুখের পূর্বে, তৎপরে ইত্যাদি) ও নানা সরস মন্তব্য দেখেশুনে ঐ রকম ধারণাটাই বোধহয় পাকা হয়ে গেছলো। যাহোক, পরে সে বিষয়ে সামঞ্জস্য করবার সুযোগও যথেষ্ট রূপেই আমি পেয়েছিলাম। তাঁর বেঙ্গল কেমিকেলের গৃহে, পরে বহু-বহুবার তাঁর নিজগৃহেও যাতায়াত করে তাঁর লেখার মতই তাঁর গভীর সৌজন্যপূর্ণ গাম্ভীর্যময় সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর অন্তরের কোন্ গভীরে যে তাঁর অন্তঃসলিল সহজাত হাস্যরস প্রবাহিত ছিল তার সম্যক সন্ধান লাভ করেছি। আর দেখছি তাঁর ধ্যানমগ্ন শোকগম্ভীর সে রূপটুকু। বাস্তবিক একাধারে এমন শান্তসমাহিত

এবং স্নিগ্ধসরস চরিত্র সংসারে বড় কম দেখা যায়।" (কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও আমাদের মন্তব্যের সমর্থক। "রাজশেখরবাবু রাশি-রাশি পুস্তক রচনা করেন নাই, মাসিক পত্রিকায় ক্বচিৎ কখনও তাঁর লেখা দেখা যায়। জীবিকার জন্য তিনি লেখেন নাই, বাণীকে বানরী করিয়া সভায় সভায় তিনি নাচান নাই, সাহিত্যকে পণ্য করিয়া তিনি গ্রন্থবণিক সাজেন নাই, দেশের সভা-সমিতি, সমাজের নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-সভা, সাহিত্যিক বৈঠক, গোষ্ঠী, মজলিস কোথাও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি সাহিত্যিক আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহাকে 'রাজশেখর দাদা' বলিয়া কেহ আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। প্রগল্‌ভতা, চাপল্য বা ধৃষ্টতা দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যায়। তিনি কাহারও স্তব প্রশস্তি গান করেন নাই, ভূমিকা, পরিচায়িকা, প্রশংসাপত্র ইত্যাদির পুটে প্রসাদ বিতরণ করেন নাই, অযোগ্যকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করেন নাই, আচার্য সাজিয়া সহস্রের প্রথাগত প্রণিপাত ও মুদ্রিত অর্ঘ্য গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার জীবনে যেমন একটা বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি দেখা যায়—রচনাতেও তেমনি আত্ম-নিগূহন ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টের পক্ষে যে detachment ও impersonality স্বাভাবিক তাহাই লক্ষিত হয়। রাজশেখরবাবু নিজে না হাসিয়া হাসান, নিজে না কাঁদিয়া কাঁদান, নিজে অন্তরালে থাকিয়া ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করেন—এ বিষয়ে তিনি বিধাতারই মন্ত্রশিষ্য।" (কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

এই মন্তব্যের আর একজন সাক্ষী বর্তমান লেখক। সে ১৯৩৪ সালের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করেছে, অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভুক্ সহকারী সম্পাদক বর্তমান লেখক, সভাপতি রাজশেখর বসু। প্রথম দিনের অধিবেশনে আগ্রহভরে সভাপতির অপেক্ষায় আছি, আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি (এ পোশাক ছাড়া অন্য পোশাকে তাঁকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না) হাতে কাগজের ফাইল, গম্ভীর প্রসন্ন মুখ। সে প্রসন্নতা কতকটা স্বভাবের, কতকটা প্রতিভার। ঐ প্রসন্নতাটুকু না থাকলে তাঁকে যে-কোন বড় একটা অফিসের অভিজ্ঞ বড়বাবু বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ক্রমে টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠল, সকলেই গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি, অধিকাংশই নামজাদা অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সংকলিত হচ্ছে, নানা শাখায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন, সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালীর সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিয়ে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথায় নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজনে কতরকম মন্তব্য করছেন সভাপতি নীরব শ্রোতা সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে দুটি একটি ক্ষুদ্র কথায়—শিখা জেবলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সভা দীর্ঘকাল চলেছিল। দীর্ঘকাল তাঁকে টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কখনও কখনও সভার অধিবেশন বসেছে তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। বস্তুতঃ সভা চালাতে এমন যোগ্য সভাপতি আমার চোখে পড়েনি। সভাপতির মধ্যে কোনদিন 'গড্ডলিকা'র লেখককে দেখতে পাইনি, বড় জোর দেখতে পেয়েছি বেঙ্গল কেমিকেলের অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে। ব্যক্তিত্বের শক্তিতে তিনি রাজশেখর বসু। পরশুরামকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য কোঠায় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্যের ভাব অপর একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেছেন। "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়

হয়েছে সেই সময় একদিন আমায় Bengal Chemical-এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময়ে Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ও সব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন—এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছে থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই, বাড়ি নয়—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সংগত; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" মেজদা—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। (কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কয়েক বৎসর পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে পরিভাষা কমিটি উঠে গেল, পরিভাষা কমিটির সিদ্ধান্তগুলি এখন 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। তখন তিনি বকুল-বাগান রোডে বাড়ি তৈরী করে উঠে গিয়েছেন। সে বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি, কখনও দরকারে, অধিকাংশ সময়েই অদরকারে। যেতেই প্রথম প্রশ্ন করেছেন, চা-না কফি? তাঁর সমাদরের মধ্যে আড়ম্বর ছিল না, তবে সহৃদয়তার কখনও অভাব দেখিনি। সেখানেও দেখেছি দুটি একটি কথায় আলোচনার জট ছাড়াতে তার স্বাভাবিক নিপুণতা। আমরা হয়তো অনেক কথা বললাম, মুহূর্তে তার মধ্যে থেকে আলগোছে আসল কথাটি তুলে নিলেন। এও তাঁর শিক্ষা ও স্বভাবের ফল। তাঁর বাড়িটিও তাঁর গায়ের খদ্দরের কোটের মত অনাড়ম্বর প্রশস্ত, বিলাসিতা নেই অথচ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী। আর একটা লক্ষ্য করবার জিনিস তাঁর গায়ের কোটটি, যেটা প্রথমেই চোখে পড়েছিল পরিভাষা কমিটির অধিবেশনে। নিপুণ জাদুকর যেমন পোশাকের নানা অন্ধিসন্ধি থেকে বিচিত্র বস্তু টেনে বের করেন, তেমনি বের করতেন তিনি কোটের পকেট থেকে। অনেকগুলি পকেট, কোনোটা চশমার খাপ রাখবার, কোনোটা ফাউণ্টেন পেন রাখবার, কোনোটা থেকে বা বের হতো পেন্সিল কাটা ছুরি ও রবার, প্রায় তাঁর 'অটমেটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' আর কি! মোটের উপরে রাজশেখর বসু সজ্জন, অমায়িক, গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, প্রকৃত হাস্যরসিকের যেমন হওয়া উচিত তার চেয়ে কম বা বেশী নন। এ পর্যন্ত যা জানা গেল, তাতে আর দশজন হাস্যরসিক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। এবারে অমিলটা কোথায় দেখা যাক। মিলে-অমিলে মিলিয়ে চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

॥ ২ ॥

কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না, তারা ছোট বড় মাঝারি যে দরেরই লেখক হোক না কেন। লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব, পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে, এখানে লেখক মানে তার শক্তির বিশেষ রূপটি। এখন কোন লেখককে সমাকভাবে বুঝতে হলে এই সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিংবা এই সমস্তর মানচিত্রের উপরে যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বুঝতে হবে। 'কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে', একথা সর্বাংশে গ্রাহ্য নহে; জীবনচরিত যদি যথার্থ হয় তবে অবশ্যই কবিকে তাতে পাওয়া যাবে। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে লেখকের শৈশব বা বড়জোর বাল্যকালের কয়েক বছর তাকে গঠন করে তোলে। 'Child is father of the man' এ আদৌ কবির অত্যুক্তি নয়। আরব্য-উপন্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সিন্দবাদ এক বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছে, মানুষের বেলায় ঠিক তার উল্টো।

প্রত্যেক মানুষ তার শৈশবকে কাঁধে নিয়ে আমৃত্যু চলছে। লেখকের পক্ষে একথা আরও সত্য, কেননা লেখক যে জীবনরহস্যের সন্ধানী তার চাবিকাঠি ঐ শিশুটার হাতে।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামের গণ্ডি', তেতালায় বসে দুপুরের আকাশে চিলের ডাক শ্রবণ, পেনেটির বাগানে প্রথম গঙ্গাদর্শন প্রভৃতি আদৌ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নয়। পারিবারিক বিগ্রহের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি, কিংবা সাগরদাঁড়ি গ্রামে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী মধুসূদনের মনে যে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মানুষ দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত যা গ্রহণ করে তাই তার যথার্থ পুঁজি, তারপরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন সঞ্চয় যতই হোক, পুঁজিতে যতই মুনাফা দেখানো যাক না কেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়ে না। এ সত্য রাজশেখর বসু সম্বন্ধে ষোলআনা প্রযোজ্য। কবিকে জানতে হলে তার জীবনের ভিতর দিয়ে জানতে হবে, কাজেই রাজশেখর বসুর সাহিত্য-বিচারের আগে তার জীবন-বিচার আবশ্যক।

রাজশেখরবাবু নিজে খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত বা কোন-রকম খসড়া লিখবার কথা ভাবেন নি। অধিকাংশ লেখক খ্যাতির প্রদীপের শিখাটিকে নিজেই উস্কে দেয়, কেউ বা প্রত্যক্ষে কেউ বা গোপনে, রাজশেখরবাবু কিছুই করেন নি। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্বজন ও অনুরাগীগণ কিছু করেছেন বটে। এখানে আমরা সেই সব রচনার সুযোগ গ্রহণ করলাম। উদ্ধৃতিগুলি কিছু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ভীত হইনি, কারণ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত পরিচয় সংযুক্ত থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

প্রথম উদ্ধৃতিতে রাজশেখর বসুর বাল্যকালের কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে।

"দ্বারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন, 'ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে।' মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে নাকি? কি শেখর হবে?' আমি বল্লাম, 'ইওর হাইনেস, যখন তাকে আশীর্বাদ করেছেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য,—আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর। দারভাঙ্গার রাজা যার শিরে আছেন,—রাজা মহেন্দ্রপালের সভাকবি থেকে এ নাম নেওয়া হয়নি।

মা যখন তার হাতে খেল্‌না দিতেন, টিনের এঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাট্টু, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দেখ্‌তো ভেতরে কি আছে,—কেন বাজে?—কেন ঘোরে?

আবার যখন কলকাতা থেকে স্প্রিং-এর নূতন এঞ্জিন আসতো, মা রাজশেখরের হাতে দেবার সময় বলতেন, দেখিস্ যেন ভাঙিস না। অমনি চার বছরের ছেলের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে গেল,—খেলনা নেবে না! তারপর মা বললেন, 'এই নে যা খুশি কর!' তখন নিয়ে খানিকক্ষণ চালিয়ে রাজশেখর এঞ্জিনটার মুণ্ডপাত করতো।

রাজশেখর আরো বড় হলে কলকাতা থেকে একটা আড়াই টাকা দিয়ে এঞ্জিন কিনে এনেছে। তাতে ইসপিরিট দিয়ে চালাবার জন্য আমাদিগকে সব ডাকলো। সোঁ সোঁ হিস হিস করচে স্টিম, কিন্তু এঞ্জিন চলচে না। সায়েনটিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন বিপদ ঘটবে বুঝে নিলে—চিৎকার করে বললে, 'দাদা পালাও। পালাও!' সকলে পালিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দড়াম করে বিকট আওয়াজে আড়াই টাকার বয়লার ফাটলো। সকলেই চিন্তিত, —কর্ড মেলের বয়লার ফাটে যদি?

রাজশেখরের বয়স যখন চার তখন সে ফুলস্টপ দিতে শিখলো। দুজন লোক একটা লম্বা কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো আর পায়জামা চায়না কোট পরা রাজশেখর একটি পেনসিল

নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেনসিল ভেঙে দিতো। এই তার হাতেখড়ি। পকেটে অটোমেটিক পেনসিল, হাতে লোহার স্ট্র্যাপ, কখনও বা কাঠের 'সোটা'।

যখন দারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থেকে 'বেগম' সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হলো বল্লাম, 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিলে।

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপারেশন হল বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করচে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেণ্টকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বল্লেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেণ্ট বল্লে, 'খাই না।' 'কখনও খাননি?' রাজশেখর উত্তর দিল, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।' ডাঃ সেন বল্লেন, 'You ought to have continued it!' এবং পেশেণ্ট ও ডাক্তার হেসে উঠলেন। যাঁরা বলেন, রাজশেখর হাসে না, তাঁরা দেখবেন রোগযন্ত্রণাতেও কি রকম মজা করবার ঝোঁক। আট বছর বয়সে মাছ মাংস ঘৃণায় ত্যাগ করলো। লোকে বলল, "রাজশেখর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবে। ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিত, মারত না।" (রাজশেখরের ছেলেবেলা : শশিশেখর বসু : শারদীয়া মুগান্তর)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বাল্যকালের বিবরণ কিছু থাকলেও বেশি করে আছে কলকাতার তাঁর কলেজ জীবনের কথা এবং চাকুরি জীবনের প্রারম্ভের বিবরণ।

"১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের সন্নিকটস্থ বামুন-পাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বামুনপাড়া হচ্ছে রাজশেখরের মামার বাড়ি। আর পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী উলা বীরনগর।

চন্দ্রশেখর বসুর চার পুত্র : শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর। চন্দ্র-শেখরের জন্ম হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহারা মহিনগর সমাজভুক্ত বড়ানিবাসী কনিষ্ঠ ধরু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে উলার মুস্তোফী বাটীতে বিবাহ করেন।

রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর সামান্য অবস্থায় জীবনসংগ্রাম শুরু করেন। তবে তাঁর যোগ্যতার গুণে দ্রুত উন্নতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি যখন যশোহর জেলায় সামান্য একজন ডাক বিভাগের কর্মচারী, সেই সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কলকাতায় যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করে কলকাতায় ইণ্ডিগো কমিশনের তদন্ত কাজ চলে।

চন্দ্রশেখর সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেনও। তার রচিত বেদান্তপ্রবেশ, বেদ্যতদর্শন, সৃষ্টি, অধিকারতত্ত্ব, প্রলয়-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে খ্যাতিলাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ম্যানেজার পদে বহাল হয়ে দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে অতিবাহিত করেন। রাজশেখরের বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরেই কেটেছে। প্রথম সাত বৎসর তিনি মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে কাটান। তারপর ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রাজ স্কুলে পড়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বারভাঙ্গার স্কুলে রাজশেখরই তখন একমাত্র বাঙালী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর পিতার নিয়ম-নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা রাজশেখর এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ প্রভাবান্বিত হন। চন্দ্রশেখর নিজে ছেলেদের হস্তলিপি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতেন। পরে বড় হয়েও তাঁরা বাল্যকালের ভিত্তিপত্তনকে অগ্রাহ্য করেন নি। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও তাঁরা সেই ধারা বহন করে চলেছেন। বাংলাদেশের বেমক্কা চরিত্রের সঙ্গে এদিক দিয়ে তাঁর আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

১৮৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনা কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়েন। এই সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে তাঁর সঙ্গে আরও জন-দশেক বাঙালী ছাত্র পড়তেন। সে মহলে সাহিত্য-আলোচনা হত, তবে তা তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। বাঙালী মন তখনও হেম-মধু-বঙ্কিমের প্রভাব-প্রতিপত্তির আওতায় চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি হয়েছে, তবে সেরকম প্রকট হয়নি!

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনার পর্ব চুকিয়ে কলকাতায় বি. এ. পড়বার জন্য এলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শাখায় তিনি ভর্তি হলেন। এই বছরই তাঁর বিবাহ। তাঁর পত্নী মৃণালিনী ছিলেন শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী। রাজশেখর ও মৃণালিনীর সন্তান বলতে একমাত্র কন্যা প্রতিমা।

প্রেসিডেন্সী কলেজে রাজশেখর যখন পড়েন সে সময়ে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও পড়তেন, তবে হেমেন্দ্রবাবু আর্টসের ছাত্র ছিলেন। রাজশেখরের সতীর্থদের মধ্যে শরৎচন্দ্র দত্ত পরবর্তী-কালে জার্মেনী থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এ্যাডেয়ার ডাট্‌ নামে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ ছাড়া আর্ট প্রেসের নরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ শেঠও তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে রাজশেখর সামান্য কিছুদিন বি. এ.-তে পড়েছেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র, এ ধারণা ভুল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্যে রাজশেখর উপকৃত হয়েছিলেন, তবে সেটা কর্মজীবনে, ছাত্রজীবনে নয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর একবছর পরে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজশেখর এম. এ. পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন।

পাটনা এবং কলকাতায় থাকবার সময়েও দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

এম. এ. পাশ করার দু-বছর পরে তিনি আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বি. এল. পরীক্ষাটিও পাশ করে ফেললেন। এরপর স্বভাবতই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের উদ্যোগ করবার কথা। কিন্তু মাত্র তিনদিনেই আদালতে পসার জমাবার উদ্যমে জলাঞ্জলি দিয়ে বসলেন। আইন ব্যবসায়ীর খোলস চাপকানগুলি বিলিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

রাজশেখর প্রকৃতিগত ভাবেই সৎ এবং ভদ্র। শুধু একথা বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। তিনি সংযত শান্ত এবং অন্তর্মুখী মানুষ। তাঁকে দিয়ে গবেষণাদির চিন্তাপ্রধান কাজই ভাল হতে পারে, এ কথা তিনি নিজেও বেশ বুঝেছিলেন।

"১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং রাজশেখর বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস-এ রাসায়নিকের পদে বহাল হলেন। তখন সারকুলার রোডে বেঙ্গল কেমিকেলের কার্যালয় ছিল। সারকুলার রোড থেকে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে নয় বৎসর এ্যালব্যার্ট বিল্ডিংস-এ ছিল। বর্তমান বেঙ্গল কেমিকেলের আপিস চিত্তরঞ্জন এভেন্যুতে অবস্থিত। প্রথমে রাজশেখর কিছুকাল থাকেন বেচু চাটুজ্যে স্ট্রীটের ভাড়া-বাড়িতে, তার-পর পার্শীবাগানের পৈতৃক গৃহে অবস্থান করেন। কাজে বহাল হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হলেন। এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন। সেই থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বদেশী প্রতি-ষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য এখনও পরোক্ষভাবে বেঙ্গল

কেমিকেল তাঁর কাছে উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।" (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। কথা-সাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)

এই দুটি অংশ পড়লে শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবনের একটা খসড়া পাওয়া যাবে। আপাততঃ এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ এর বেশী তথ্য পাইনি, আর আমার বিচারে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই বয়সের মধ্যেই তাঁর ভাবী রচনার গাঁথুনি পাকা হয়ে গিয়েছে। তবে আর একটা পরিচয় এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। চোদ্দ নম্বর পার্শীবাগান বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। এই বাড়িটি ও এখানে যে নিয়মিত আড্ডা বসতো নামান্তরে পরশুরামের রচনায় তা অমরত্ব লাভ করেছে।

"১৪ নম্বর পার্শীবাগানে একটি বিরাট আড্ডা বসিত। পরশুরামের গল্পে ইহা ১৮ নম্বর হাবসীবাগান বলিয়া পরিচিত। ১৪ নম্বর ছিল বসু ভাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। চারি ভ্রাতার মধ্যে রাজশেখর বসু মধ্যম, আমরা মেজদা বলিতাম; ডক্‌টর গিরীন্দ্রশেখর বসু কনিষ্ঠ। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ। প্রতিদিনই মজলিস বসিত, জমজমাট হইত রবিবার, বৈঠকখানা গমগম করিত, সেদিন সকলের ছুটি। সেই বৈঠকে কত ডাক্তার, কত অধ্যাপক, কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক, কত শিল্পী, কত ঐতিহাসিক উপস্থিত থাকিতেন তার ইয়ত্তা নাই। তার নামকরণ করা হইয়াছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। প্রথমে একটা ইংরেজী নামই ছিল, বাংলা নামটি দেন রাজশেখরবাবু। সেই মজলিসে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে চলিত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি রবিবার বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি একসঙ্গে দুপুরবেলা সেই মজলিসে উপস্থিত হইতাম। আড্ডাধারী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন। তিনি প্রতিদিন দুপুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার হাতে তৈয়ারী চা আড্ডার একান্ত উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ ভার আর্টিস্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এ দায়িত্ব কাহারও উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার তৃপ্তি ছিল না।

এই বৈঠকে জলধরদা নিত্য আসিতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডক্টর দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য যদু-নাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিন-চন্দ্র কুণ্ডু কখনও কখনও আসিতেন। পাটনার অধ্যাপক রঙীন হালদার ছুটি পাইলেই পার্শীবাগানে সমুপস্থিত হইতেন। ক্যাপ্টেন সত্য রায়ের পিতা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলেই এখানে আসিতেন। আরও অনেকে থাকিতেন যাঁহাদের সহিত সাহিত্য বা অধ্যাপনার কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাঁহারা গল্প এবং কথাবার্তায় আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। জলধরদা অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কানে না যায় এমন সব কথার আলাপ যখনই জমিয়া উঠিত তখনই দাদা বলিয়া উঠিতেন, 'আঁ, কি বলছ ভাই?' মজাদার কথা কদাচিৎ তাহার কান এড়াইয়া যাইত।

একদল তাস লইয়া বসিত। ক্যাপ্টেন সত্য রায় ও আমি মাঝে মাঝে দাবা লইয়া বসিতাম। গিরীন্দ্রবাবু কখনও কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ কখনও খেলায় আমল দিতেন না। এই দাবা খেলার মধ্যে দিয়াই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠতা জন্মে, কিন্তু সে এখানে নয়, রবিবাসরের এক বার্ষিক উদ্যান সম্মেলনে, 'তুলসীমঞ্চে'।

বড়-দা শ্রীশশিশেখর বসু বড় মজার গল্প করিতে পারিতেন। তিনি ইংরেজী লিখিয়ে, ইংরেজী কাগজে তাঁহার রসরচনা বাহির হইত। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছেন। রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' এখন প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে। সেজা-দা শ্রীকৃষ্ণ-শেখর বসু উলা বীরনগরের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পল্লী-উন্নয়নের কথা হইলে তিনি মশগুল হইয়া পড়িতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার মজলিসী গল্প করিতে পারিতেন।' (উৎকেন্দ্র সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

আর একটি ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গটা শেষ করবো ইচ্ছে আছে। যতদূর জানি রাজশেখরবাবু খুব পত্রালাপী লোক ছিলেন না। তাঁর যে সব পত্র পাওয়া যায় সেগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ তাঁকে বোঝবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই রকম একখানি পত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"হাস্যরসিক শ্রীরাজশেখর বসুকে দেখিয়াছি, আবার শোকপ্রাপ্ত শ্রীরাজশেখর বসুকেও দেখিয়াছি।

পত্নীবিয়োগ সমবেদনা জানাইয়া শ্রীনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখি তদুত্তরে এই পত্রখানি পাই।

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
২।১২।৪২

সুহৃদ্‌বরেষু,

চারুবাবু, আপনার প্রেরিত লেখা ভাল লাগল। মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। যদি এর উল্টোটা ঘটত তবে তাঁর মানসিক শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত। পুরুষের বাহ্য পরিবর্তন হয় না, খাওয়া পরা পূর্ববৎ চলে, কিন্তু মেয়েদের বেলায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে।

নিরন্তর শোকাতুর আর একজনকে দেখলে নিজের শোক দ্বিগুণ হয়। গতবারে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এবারে শোক উসকে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্য মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।

আশা করি আপনার সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা হবে এবং তার আগে খবর পাব।

ভবদীয়
রাজশেখর বসু

তিনি লিখিতেছেন,—আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়। কিন্তু তা ঠিক নয়। গীতায় আছে,—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

যাঁহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ।

অনেক দিন অনেকবার অতি নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিত প্রজ্ঞ মহাপুরুষ রাজশেখরকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।" (স্থিতপ্রজ্ঞ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে রাজশেখর বসু সম্বন্ধে কয়েকটি মূল তথ্য জানতে পাওয়া যাবে, যেগুলির পদে পদে প্রয়োজন হবে তাঁর সাহিত্য ও চরিত্র বিচারের সময়ে। (১) তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বিজ্ঞান শিক্ষা, এই বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে আইন পাশ করাকেও ধরতে হবে, (২) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কৃতী প্রধান ব্যক্তি রূপে দীর্ঘকাল অবস্থিতি, (৩) সংসার সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। পাশীবাগানে আড্ডায় কখনও যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তদ্‌সত্ত্বেও অনায়াসে অনুমান করতে পারি যে, তিনি সেই আড্ডার মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বাগ্‌যত ছিলেন, মাঝে মাঝে একটি দুটি হাসির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যেতেন। তিনি হাসতেন, তবে হাসতেন কদাচিৎ। 'অন্যে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর'। (৪) চারুবাবুকে লিখিত পত্রখণ্ডে যে স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্ত ভাব প্রকাশিত, তাতে মিলিত একাধারে গীতার ও বিজ্ঞানের শিক্ষা। গীতোক্ত আদর্শ পুরুষ বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক। তিনি দুই-ই ছিলেন। এখন এই বিশ্লেষণ-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সম্বল করে তাঁর সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হবো আর আশা করি দেখতে পাবো যে, বিচারের মূলে উপাদান আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে।

॥ ৩ ॥

রাজশেখর বসুর গ্রন্থাবলী তাঁর দুটি নামে পরিচিত, রাজশেখর বসু ও পরশুরাম। এই দুই নামের স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন, এমন আর কোন লেখক রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দুটি এমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আলাদা কোঠায় রাখা যে খুব কঠিন এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। তাঁর পক্ষে এ কাজ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল একজন লেখক তা প্রকাশ করেছেন, "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে সেই সময়ে একদিন আমায় Bengal Chemical এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময়ে Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীর-ভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ওসব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন, এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই বাড়ি নয়,—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সঙ্গত; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" (মেজদা—শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্র। কথাসাহিত্য ঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০)।

রাজশেখর বসু নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীতে মনীষার পরিচয়, অবশ্য শিল্পীর পরিকল্পনা গৌণভাবে আছে। আর পরশুরামের ছদ্মনামে পরিচিত জনবল্লভ গল্পের বইগুলির শিল্পীর রচনা, যদিচ গৌণভাবে মনীষার দেখা পাওয়া যাবে।

আমরা প্রথমে পরশুরাম রচিত গ্রন্থাবলীর বিশদ আলোচনা করবো, পরে রাজশেখর বসু রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা সারলেই হবে।

রাজশেখরবাবু জনসমাজে হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, আরো স্বরূপে বলতে

গেলে ব্যঙ্গরসিক বলা যেতে পারে। মোটের উপরে একথা স্বীকার্য যে, তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান হাসি। কাজেই হাসির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া আবশ্যক।

সূর্যালোককে বিশ্লিষ্ট করে ফেললে সাতটি রং পাওয়া যায়, যার এক প্রান্তে লাল, অন্য প্রান্তে বেগনী, মাঝখানে অন্য রং। শুভ্র হাসিকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায় অনেক জাতের হাসি পাওয়া যাবে, যার এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, অন্য প্রান্তে প্রচ্ছন্ন অশ্রু; ওরই মধ্যে এক জায়গায় নিছক কৌতুকহাস্যও আছে। আমরা যখন কোন লেখককে হাসির গল্পের লেখক বলি, তখন বিচার করা আবশ্যক এই হাসির বর্ণালীর মধ্যেই কোনটি তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একাধিক উপাদানই তাঁর রচনায় থাকতে পারে। বিশুদ্ধভাবে একটি মাত্র উপাদানকে অবলম্বন করে রচিত এমন গল্প খুব বিরল। বিশেষতঃ আধুনিক মন মিশ্ররীতির পক্ষপাতী, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একাধিক উপাদান মিলিত হয়ে যায় তাঁর রচনায়। শেক্সপীয়ারের 'ফলস্টাফ' এই রকম একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার গঠনে কৌতুকহাসি থেকে আরম্ভ করে প্রায় সবগুলির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফলস্টাফের বিদায়ে (Rejection of Falstaff) প্রচ্ছন্ন অশ্রু প্রায় অপ্রচ্ছন্নভাবে ধরা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দীনবন্ধুর নিমে দত্তর চরিত্রে শেষে দিকে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অশ্রু উদ্গত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠ চরিত্রেও হাসির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর রেশ আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চরিত্র এ বিষয়ে বোধ করি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। হাসির স্ফটিকশিলায় কমলাকান্ত চরিত্র গঠিত, তা থেকে শতমুখে হাসি বিচ্ছুরিত হতে থাকে, কিন্তু যেমনি একটু ব্যথার তাপ লাগে, অমনি স্ফটিক অশ্রুতে বিগলিত হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখকগণের কেউ অমিশ্র হাসির কারবার করেন নি। বাংলা সাহিত্যে অমিশ্র হাসির একমাত্র কারবারী বোধ করি অমৃতলাল বসু। তাঁর হাসি প্রায় সময়েই প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এখন বিচার্য পরশুরামের স্থান হাসির বর্ণালীর মধ্যে কোন দিকে, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে না প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিকে। এই কথাটি বোঝাবার উদ্দেশ্যে আর একজন প্রধান হাসির গল্পের লেখকের নাম করা দরকার, তিনি ত্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, কিন্তু হাসির বর্ণালীর মধ্যে তাঁদের স্থান একত্র নয়। ত্রৈলোকানাথ আছেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিক ঘেঁসে আর পরশুরাম আছেন প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে ঘেঁষে। ত্রৈলোকানাথের হাসি প্রধানতঃ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা হলেও তাতে অন্য উপাদান আছে, পরশুরামে মিশ্রণ নেই এমন বলি না, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, এঁদের একজন আছেন বর্ণালীর লালের দিকে, আর একজন বেগনীর দিকে। একজনের আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, আর একজনের আবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।

ম্যাথু আর্নল্ড-এর একটি সুভাষিত আছে "Literature is Criticism of life"— এই উক্তিটি নিয়ে গত একশ বছর তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত নাই। কাজেই সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা বাহুল্য। নিছক কৌতুকহাস্য বাদ দিলে দেখা যাবে যে, হাসি যে জাতেরই হোক না কেন তা Social Criticism ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই Criticism বা সমালোচনার প্রকার ভেদ আছে। কোন লেখক সমালোচক হিসাবে তিরস্কার করেন কেউ অশ্রুপাত করেন, দুজনের পন্থা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক।

সমাজ সংস্কার হাসির (নিছক কৌতুকহাস্য ছাড়াও) উদ্দেশ্য বলেই হাস্যরসিককে একটা মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। সে মাপকাঠি Ethical হতে পারে, Intellectual হতে পারে, Social হতে পারে বা অন্য কোন রকমের হতে পারে। একটি Norm বা আদর্শ লেখকের মনের মধ্যে থাকে, সমাজের যেখানে সেই আদর্শের চ্যুতি ঘটছে সেখানে তিনি মাপকাঠিখানি বের করে এগিয়ে আসেন। এখানে বিশুদ্ধ কমেডির সঙ্গে Satire বা ব্যঙ্গের তফাৎ।

বিশুদ্ধ আনন্দ দান ছাড়া কমেডির আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অন্য সর্বপ্রকার হাসি উদ্দেশ্যমূলক। কমেডি লেখক আনন্দ দান করেন, ব্যঙ্গরসিক বিচার করেন; কমেডি লেখক উৎসবরাজ, ব্যঙ্গরসিক বিচারক। বিচারে ভুলভ্রান্তি হতে পারে, এক আদালতের রায় অন্য আদালতে উল্টে যেতে পারে, এক যুগের নজির অন্য যুগ না মানতে পারে এমন উদাহরণ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর। বিশুদ্ধ আনন্দের মার নেই, বিশুদ্ধ বিচার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে ব্যঙ্গলেখকের স্থান অত্যুচ্চ সাহিত্যে সর্বোচ্চশ্রেণীতে কখনো নির্দিষ্ট হয় না। সকলেই তার গুরুত্ব স্বীকার করে, তবু বিশুদ্ধ আনন্দদাতার সঙ্গে সমান আসন দিতে রাজী হয় না। বিচারকের স্থান আদালতে, আনন্দদাতার স্থান অন্তঃপুরে।

নাটকে এই সমালোচনার কাজটি বিদূষক করে থাকে, নীচু আসনে বসেও রাজার দোষ দেখাতে সে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু নাটকের চূড়ান্ত পর্বে বিদূষককে কদাচিত দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ আর কিছুই নয়, বিদূষণার সীমা অন্তঃপুরে ও অন্ত্যঅঙ্কের বাইরে। এই সীমা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যঙ্গরসিক স্বকর্তব্য সাধনে যে নিরস্ত হয় না, তার কারণ বিশেষ আদর্শের প্রেরণা তাকে চালিত করে। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে প্রলাপভাষিণী কবিতা তার কানে কানে আনন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে আনন্দ মন্ত্রে বৈষয়িক সার্থকতা কিছুমাত্র কম নেই, সেই কবিতাকে মানুষ সর্বোচ্চ আসন দিয়ে নীচে বসিয়ে রাখে ব্যঙ্গরসিককে, যার দৃষ্টি সদাজাগ্রত না থাকলে সমাজস্থিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে যে ব্যঙ্গরসিক প্রচ্ছন্ন অশ্রুকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে তার প্রতি মানুষের মন কিছু সদয় বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারককে সে মনে ভয় করলেও হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেয় না। পরশুরাম ও ত্রৈলোকানাথ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গ ব্যাপারটি আরেকবার বোঝাতে চেষ্টা করবো। এখন এইটুকুই যথেষ্ট যে পরশুরামের হাসি প্রধানতঃ তিরস্কার ঘেঁষা, যার আবেদন মানুষের বুদ্ধিতে। কিন্তু তিনি শুধুই হাসির গল্প লিখেছেন এ কথা সত্য নয়। তাঁর রচনার মধ্যে এমন অনেক গল্প আছে যা ঠিক হাসির গল্প নয়। অন্য নামের অভাবে তাদের সামাজিক গল্প বলতে হয়। যথা—কৃষ্ণকলি, চিঠিবাজি, দীনেশের ভাগ্য, যশোমতি, ভূষণ পাল, ভগবান ঠাকুর ইত্যাদি।

এ সব গল্পে হাসি যে নেই তা নয়, তবে হাসিটা তার প্রধান উপাদান নয়। একবার হাস্যরসিক বলে নাম রটে গেলে তার নিতান্ত সাধারণ কথাতেও হেসে ওঠা পাঠক কর্তব্য মনে করে। শুনেছি প্রসিদ্ধ কমিক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একটি সভায় ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথম বাক্যটাও শেষ করতে পারেন নি, ঘনঘন হাসি ও করতালিতে শ্রোতারা নিজেদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছিল।

পরশুরামের এমন কতকগুলি গল্প আছে যা গভীর মনীষা-প্রসূত। মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ, সমাজের অবস্থা, মৃত্যুর রহস্য, পৃথিবীব্যাপী লোভ-অশান্তির পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে দুঃসাহসিক চিন্তার পরিচয় বহন করে এই সব গল্প। পরোক্ষভাবেও হাসির সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যেহেতু পরশুরামের রচনা-কাজেই পাঠকের পক্ষে হাসা একপ্রকার জাতীয় কর্তব্য। যথা—গামানুষ জাতির কথা, অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা, ভীম গীতা, মাঙ্গলিক, কাশীনাথের জন্মান্তর, সত্যসন্ধ বিনায়ক, নির্মোক নৃত্য, কর্দম মেখলা প্রভৃতি।

এই সব গল্পগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ আর কিছুই নয়, পরশুরাম প্রধানতঃ ব্যঙ্গ গল্পের লেখক হলেও কেবলই ব্যঙ্গ গল্প তিনি লেখেন নি, এমন অনেক গল্প লিখেছেন যা মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি যদি অন্য ব্যঙ্গরচনা নাও লিখতেন তবে হয়তো এত জনপ্রিয় হতেন না সত্য,

কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করতো। ব্যঙ্গরচনার দ্বারা পাঠকের মনে নিজের যে Image তিনি তৈরী করে তুলেছেন সেই Image-এর আড়ালেই তাঁর অনেক কীর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালী পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠল, এ আবার কে এলো? Curtain Raiser হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এক গল্পেই আসর মাত। তারপরে পাঠকের ঔৎসুক্য আর ঘুমিয়ে পড়বার অবকাশ পায়নি। চিকিৎসা-সংকট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডীর মাঠে একত্র গ্রন্থাকারে গড্ডলিকা। পরে প্রকাশিত হ'ল কজ্জলী গ্রন্থ, অর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায় স্বয়ম্বরা, কচি-সংসদ ও উলট-পুরাণের সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রথম যা একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্ররূপে দেখা দিয়েছিল, কালক্রমে তা উজ্জ্বল বৃহৎ নির্নিমেষ গ্রহের রূপ ধারণ করে সৌর পরিবারের পরিধি বাড়িয়ে দিল। পরে আরও সাতখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তবে একথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে অদ্যাবধি প্রথম বই দু-খানাই সবচেয়ে জনপ্রিয়! এই জনপ্রিয়তার কারণ কি?

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিকরূপে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ, যে বয়সে নাকি অধিকাংশ লেখকের আদিপর্ব শেষ হ'য়ে গিয়ে মধ্যপর্বে প্রবেশ ঘটে। বিয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত তাঁর কোন সাহিত্যিক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে ছিল না, হঠাৎ তিনি পাকা লেখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পাঠক একেবারে চমকে গেল, কিন্তু সে চমক পীড়াদায়ক নয়, সুখদায়ক। তিনি ধীরে-সুস্থে পাঠককে তৈরী করে নিয়ে পরিণত রচনায় উপনীত হননি, পাঠককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি। পাঠকের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে।

কোন কোন লেখক, তার মধ্যে অতিশয় শক্তিমান লেখক আছেন, ধীরে ধীরে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই ধীরতায় পাঠকের চক্ষু অভ্যস্ত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অতি অপরিণত রচনা নিয়ে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, তার পরে শতাব্দীর না হোক দশকের, প্রহরে প্রহরে পরিণতির মধ্য গগনে উত্তীর্ণ হন। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে এবং মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য দিয়ে পাঠক সমাজকে চমকে দিয়েছিলেন। এই তিন মহারথীর সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায় যে, রাজশেখর বসু অতর্কিতে চমকে দিয়ে পাঠকের মনকে অধিকার করে নিলেন। মনে রাখতে হবে যে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রকাশের সময়ে তাঁর বয়স দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশকালে লেখকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

এখন চমক যতই বিস্ময়কর হোক ক্রমে তার দ্যুতি ম্লান হ'য়ে আসে। পরশুরামের ক্ষেত্রে তা হয়নি, তার কারণ পাঠকের চমককে নিত্য নূতন উদাহরণ যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, গড্ডলিকা ও কজ্জলীর এগারটি গল্পে। অবশ্য একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পরবর্তী সাতখানি গ্রন্থে চমকের দ্যুতি অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। একটি কারণ, পাঠকের চোখ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অন্য কারণ আছে তার আলোচনা যথাস্থানে। এবার পূর্বসূত্র টেনে জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা যে গল্পে বর্ণিত নরনারীর নূতনত্বে পাঠক বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্টে। এসব নরনারী অত্যন্ত পুরাতন বলেই তারা আকর্ষণ করেছে

পাঠকের চিত্ত। পুরাতন তবে অতিপরিচয়ের ধুলো জমে জমে সে-সব আচ্ছন্ন হয়ে সুপ্তিবৎ বিরাজ করছিল। পরশুরামের হাসির দমকা হাওয়ায় সে ধুলো সরে যেতেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। বিস্মিত পাঠক বলে উঠল বাঃ বাঃ, এসব তো সামনেই ছিল অথচ দেখতে পাইনি! ভোরবেলা দরজা খুলতেই বৃহৎ একটা গাছ দেখতে পেলে পাঠক অবশ্যই চমকিত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিস্ময়কে চাপা দেয় বিরক্তি, তখন সে কুড়ুলের সন্ধান করে। না, পরশুরামের প্রথম রচনা দরজার সম্মুখের বনস্পতি নয়, দিগন্তের গিরিমালা। শীতের কুয়াশায়, গ্রীষ্মের ধুলোয় আর বর্ষার মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, আজ হঠাৎ শরৎকালের বৃষ্টি-ধৌত নির্মল আকাশে তার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখে মনটি প্রসন্ন হয়ে উঠল, বাঃ ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি আছে দেখছি। পূর্বসংস্কারহীন নূতন প্রথমটা চমকে দিলেও তার পরিণাম বিরক্তিতে, আর যে নূতন পূর্বসংস্কারের সূত্র ধরে অতি পরিচয়ের পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রকাশ পায়, সে কখনো পুরাতন হয় না; কারণ পুরাতনত্বেই তার যথার্থ পরিচয়। সূর্যোদয়ে প্রত্যাশিত বিস্ময়, জাদুকরের আমগাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় প্রথম বারের পরে দ্বিতীয় বারে বিরক্তিকর।

এরা যে সবাই পুরাতন, অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত প্রত্যাশিত। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিক —এরা কি আজকের! এদের কেউ কেউ মুরারি শীলের সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করেছে, ভাড়ুদত্তর সঙ্গে বাজারে তোলা আদায় নিয়ে ভাগাভাগি করেছে, আবার ঠক চাচার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছে, দুনিয়া বুরা মুই সাচা হয়ে কি করবো? জমরুধারা আসরে কেদার চাটুজ্যে গল্পের শিকল বোনেনি এবং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যে নদেরচাঁদের ব্যবসার পার্টনার ছিল না এমন কথা কে হলপ করে বলবে। এরা সবাই অতিপরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই চান্‌তি পারা যায়নি!

॥ ৫ ॥

আমেরিকার ভূভাগ গোড়া থেকেই ছিল, কলম্বাস তাকে আবিষ্কার করলো। পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণ গোড়া থেকেই ছিল, পরশুরাম সন্ধানীরূপে তাদের আবিষ্কর্তা। প্রতিভা দুই ভাবে কাজ করে, আবিষ্কার ও সৃষ্টি, নূতন জগতের উদ্ঘাটন ও নূতন জগতের নির্মাণ, কলম্বাস ও বিশ্বামিত্র। এ দুই গুণের কোন একটাকে একচেটিয়া মনে করলে ভুল হবে। অল্পবিস্তর সব প্রতিভাবান্ লেখকেই পাওয়া যাবে। আয়েষা সৃষ্টি, বিদ্যাদিগ্‌গজ আবিষ্কার; গোরা সৃষ্টি, পানুবাবু আবিষ্কার। তবে এ পর্যন্ত বলতে পারা যায় যে স্যাটায়রিস্টে, ব্যঙ্গ প্রতিভার সৃষ্টির তুলনায় আবিষ্কারের ভাগ বেশি। সুইফটের লিলিপুটকে যতই অভিনব মনে হোক, আসলে সে মানুষকে উল্টো দূরবীনের দৃষ্টিতে আবিষ্কার। পরশুরামের আবিষ্কারের ভাগটাই সুপ্রচুর, তবে সৃষ্টিকার্যও আছে। জাবালি চরিত্র মহৎ সৃষ্টি, কৃষ্ণ-কালি (কালিন্দী) ও চিরঞ্জীবও সৃষ্টিকার্য। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, পাঠকের বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে সে মোটেই বিস্মিত হয়নি, অন্ততঃ নূতন দেখে বিস্মিত হয়নি। প্রত্যাশিত পুরাতনকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল। তৃতীয় কারণ পরশুরামের ভাষা।

এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত, সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। পাঠক-সমাজ যখন সাধুভাষাকে প্রগতির চরম লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল সাধু ভাষার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন কোন সম্ভাবনা আর তার মধ্যে নেই, তখন গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার

এই পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়জনক। বস্তুতঃ পড়বার সময়ে খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কি কথ্য, পরে হিসাবে দেখা যায় সাধু ভাষা।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা পাঠককে প্রতি নিঃশ্বাসে তার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়, নিজের কৌশলকে লুকোবার কৌশলটা তার অনায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ভাষাতেও এই ত্রুটি। গল্পলিকা ও কজ্জলীর ভাষারীতি সাধু, তবে জটাজুটধারী ভেকধারী সাধু নয়, এমন সাধু যে সাধুত্ব গোপন রাখতে সমর্থ। সবশুদ্ধ মিলে ভাষাটি ভারী তৃপ্তিদায়ক, ভাবের স্বাভাবিক বাহন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। হাস্যরস রচনার ভাষা সাধু হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার গাম্ভীর্যে আর ভাবের লঘুতায় যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা হাসির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। কথ্য ভাষার চটুলতা আর হাসির চটুলতায় মিলে যায়, মুহুর্মুহু পাঠকের মনকে দ্বন্দ্বের চকমকি স্ফুরণে আলোকিত ও চকিত করতে পারে না। বিষয়টির বিস্তার অনাবশ্যক, কতকগুলি উদাহরণ দিলেই চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য ও কমলাকান্ত, রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার প্রভৃতির উল্লেখ যথেষ্ট। অনেকে আক্ষেপ করেন বাংলা সাহিত্যে আজকাল যথেষ্ট হাস্যরসের রচনা লিখিত হচ্ছে না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান, হাসির রচনা আজ ভ্রষ্টবাহন। সিদ্ধিদাতা গণেশ চটুল মূষিক বাহনে চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এমন কার সাধ্য। যে-শূড়ের বহর! গভীর গম্ভীর ভাব কথ্যভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলেও, কথ্যভাষায় হাস্যরস! নৈব নৈব চ। এই একটি কারণ যেজন্য পরশুরামের শেষ ছয়খানি গল্পগ্রন্থ কিছু পরিমাণে ম্লান। সেগুলির বাহন কথ্যভাষা। সাধুভাষা ও পয়ার ছন্দের আয়ু বঙ্গভারতীর আয়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গণনীয়। নূতন নূতন গুণীর হাতে অভাবিত রূপে যুগে যুগে তারা দেখা দেবে।

॥ ৬ ॥

হাসির গল্প লিখবার বিপদ এই যে, পাঠকে হেসেই সব কর্তব্য শোধ করে দেয়, আদৌ তলিয়ে দেখতে চায় না। হাসির গল্পে আর এমন কি থাকবে, ভাবটা এইরকম। কেমন করে জানবে যে হাসির গল্পে না থাকতে পারে এমন বস্তু নাই। ভাষার জাদুর কথাই ধরা যাক। হাস্যরস একান্ত ভাবে সামাজিক ব্যাপার। হাসিতে সামাজিক মনের প্রকাশ, অশ্রুতে প্রকাশ ব্যক্তিমনের। স্বভাবতই হাস্যাত্মক রচনায় নিসর্গ বর্ণনার স্থান সংকীর্ণ। যখন তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে, নূতন খাত খনন করে নিতে হয়। গঙ্গা প্রবাহিত স্বাভাবিক খাতে, গঙ্গার খাল কৃত্রিম খাতে যা নাকি সামাজিক চেষ্টার ও সামাজিক প্রয়োজনের ফল।

লম্বকর্ণ গল্পে কালবৈশাখীর এবং ভুশণ্ডীর মাঠে অপরাহ্নের বর্ণনা দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালবৈশাখীর ও অপরাহ্নের স্বভাব বর্ণনার সঙ্গে সূনিপুণ ভাবে মিশে গিয়েছে ব্যঙ্গরসিকের স্বভাব। আবার কচি-সংসদ গল্পে দুটি বর্ণনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। একটি শরৎ আবির্ভাবের, আর একটি রেলগাড়িতে যাত্রার সুখের।

শরতের প্রথম পদক্ষেপের নিখুঁৎ স্বাভাবিক বর্ণনা, তারপরেই সামাজিক মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। "টাকায় এক গণ্ডা রোগারোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে।" আবার রেলগাড়িতে যাত্রার বর্ণনার মধ্যেও কেমন অনায়াসে নিসর্গের স্বভাব ও সামাজিক স্বভাব গঙ্গাযমুনায় মিশে গিয়েছে। "কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ,

হঠাৎ জানলা দিয়ে এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপরে ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে জর-পেট ভাল-ভাল খাদ্যসামগ্রী, তাছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ির সঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জির ডান্ডার ঝঞ্জনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাৎ হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমনীন্ অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত্!" শেষোক্ত বাক্যে দ্রুত ধাবমান গাড়ির চলার ছন্দ কেমন সুকৌশলে অথচ কেমন অনায়াসে ধরা হয়েছে। উদ্ধত পাখীকে ফাঁদ পেতে ধরবার চেয়েও এ যে কঠিন। সাহিত্যে সবচেয়ে দুঃসাধ্য ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতিকে মেলানো, আর ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রেমকে মেশানো। উপরে উদ্ধৃত সবগুলি বর্ণনায় প্রথম দুঃসাধ্যকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়ে ওঠবার উদাহরণ পরে দেওয়া যাবে। মোট কথা এই যে এহেন নিসর্গ বর্ণনা ব্যঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না, না গল্পগুচ্ছে না কপালকুণ্ডলায়। এ পরশুরামের নিজস্ব। আর ভাষার এই ছন্দ, গতি ও ভঙ্গীও অন্যত্র বিরল, পরশুরামের শেষের বইগুলোতেও নেই। সে-গুলির আপেক্ষিক অপ্রিয়তার এ যে একটা কারণ তা আগেই বলেছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বাধা নেই যে, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে সাধুভাষা ব্যবহার করলে তাদের মর্যাদা রক্ষিত হতো।

॥ ৭ ॥

গল্পলিকা ও কজ্জলীর আর একটি ঐশ্বর্য ছবিগুলি। কথার সঙ্গে ছবিগুলি গানের সঙ্গে সঙ্গত নয়। সঙ্গত বন্ধ হলেও গানের মাধুর্য কমে না। ছবিগুলিকে বলা চলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত নীচে লালকালি দিয়ে দাগ টেনে দেওয়া, কিংবা সঙ্গীর উত্তরীয় প্রান্ত টেনে দৃশ্য বিশেষের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। ওগুলো আছে বলে পাঠক একটু অতিরিক্ত সচেতন হয়ে ওঠে, ওগুলো না থাকলে অনবহিত পাঠক সেগুলো হয়তো অতিক্রম করে যেতো। শেষের ছয়খানি গ্রন্থের আপেক্ষিক ম্লানতার কারণ নীচে দাগটানার কিংবা উত্তরীয় প্রান্তে টান দেওয়ার অভাব। তৃতীয় গ্রন্থ হনুমানের স্বপ্নের কোন কোন গল্পে যথা হনুমানের স্বপ্ন ও প্রেমচক্রে ছবির গুণে অপকর্ষ লক্ষ্য করবার মতো। খুব সম্ভব চিরকর নিজের ক্ষমতার ক্ষীণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন বলেই শেষের বইগুলি অলংকৃত করতে ক্ষান্ত হয়েছেন। তার ফলে গল্পগুলির আবেদন মন্দ হয়ে এসেছে। তবে প্রথম বই দু'খানিতে লেখায় রেখায় এমন মিলে গিয়েছে যে, এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, গল্প অনুসারে ছবি আঁকা, না ছবি অনুসারে গল্প লেখা।

পরশুরামের গল্পের আর একটি বিশেষ লক্ষণ পড়বার সময়ে পাঠক ভারী একটি আরাম ও স্বস্তি বোধ করে। বর্তমান জীবনের তাড়াহুড়া, ব্যস্ততা, গেল গেল ভাব এদের মধ্যে নাই। বর্তমান ব্যস্তসমস্ত জীবনে নিত্য বিড়ম্বিত পাঠক এখানে পদার্পণ করে ভারী আরাম বোধ করে। উদাহরণ-স্বরূপ কেদার চাটুজ্যে গল্পমালার উল্লেখ করা যেতে পারে। বংশ-লোচনবাবু গ্রন্থকর্তা হলেও গল্পকর্তা কেদার চাটুজ্যে। বংশলোচনবাবুর বাড়ির আড্ডাটি ১৯ নম্বর পাশীবাগান লেনের আড্ডার প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

"চাটুজ্যে মশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, রাত্রি ন'টা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচী

নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যা। বিনোদ উকীল বলিলেন—তাই তো বাসায় ফেরা যায় কি করে? গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন, বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক'রো। আপাততঃ এখানেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, বলে আয় তো বাড়ির ভেতর। চাটুজ্যে বলিলেন, মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।"

এই চিত্র যুদ্ধপূর্ব সত্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাঠকের চিত্তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বসিত করে তোলে। রেশন কার্ড নাই, কন্‌ট্রোল নাই, ইলিশ মাছ চালান বন্ধ হওয়ার আশংকা নাই; যত রাতেই বাড়িতে ফেরো না কেন, ট্রাম বাস পাওয়া যাবে, নাই ধর্মঘট, নাই ছিনতাইয়ের আশংকা। কয় বছর আগেকারই বা কথা। কিন্তু সত্যযুগ তো লৌকিক বছর গণনার হিসাবের উপরে নির্ভর করে না। প্রত্যেক যুগ বিগত যুগের মধ্যে অচরিতার্থ আশার মরীচিকা দেখে—সেই তো সত্যযুগ। জাবালি পত্নী "হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ংগবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায়, তাও ভয়সা।" আজকের সকলের মধ্যেই একজন হিন্দ্রলিনীর বাস। আবার আগামী যুগ বর্তমান কালের দিকে তাকিয়ে, ধর্মঘট, ঘেরাও, কন্‌ট্রোল, রেশন, ছিনতাই-শঙ্কিত যুগকে সত্য বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। পাঠকে কেদার চাটুজ্যে গল্পমালা পড়বার সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চিরন্তন বাসা সত্যযুগে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। এই গল্পগুলির রসের নিত্যতার কারণ বংশলোচনবাবুর বাড়ির আড্ডা ও আড্ডাধারীগণ নিত্যকালের অধিবাসী, যে নিত্যকাল লৌকিক হিসাবের ঊর্ধ্বে। সতত বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে এই শান্তিময় দ্বীপটিতে পদার্পণ করবামাত্র এখানকার নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়। কিছু মাত্র দায়িত্ব নাই, বসে বসে কেদার চাটুজ্যের গল্প শোনো, (বাধা দিলে ব্রাহ্মণ চটে যায় এমন কাজটি করো না), নগেন ও উদয়ের পরস্পরকে আক্রমণ কৌশল লক্ষ্য করো, পারো তো বিনোদ উকীলের কোল থেকে তাকিয়াটা টেনে নাও, আর সম্ভব হলে বংশলোচনবাবুর অনবধানতার সুযোগে পাশে থেকে Happy though Married বইখানা আলগোছে টেনে নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা করো। রাত যতই হোক মসুর ডালের খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজার আসরে যথাসময়ে ডাক পড়বে। স্বচ্ছল গৃহস্থ বংশলোচনবাবুর বাড়িতে সর্বদা দু'চারজন অতিরিক্তের জন্য চাল নেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনও আছে, কেননা, ১৪ নম্বর পাশীবাগান লেনের আড্ডাধারীরা ক্রমে ক্রমে ওখানে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন, এতদিনে বোধহয় সকলেই খণ্ডকালের সীমা পেরিয়ে নিত্যকালের আসরে গিয়ে জুটেছেন।

॥ ৮ ॥

পরশুরামের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ কারণ তার গল্পগুলির বাহনের বিশেষ প্রকৃতি। এই বিশেষ প্রকৃতিকে সাধারণভাবে হাস্যরস বলা বলে, কিন্তু আগে মনে করিয়ে দিয়েছি যে হাস্যরসের বর্ণালী বা বর্ণচ্ছটায় নানা রঙ, এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু, আর এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার, মাঝখানে আছে বিশুদ্ধ কৌতুকহাস্য ও অজ্ঞাতের হাসি। আরও বলেছি যে, পরশুরামের হাসি অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার-ঘেঁষা। সেই সঙ্গেই বলেছি যে, আধুনিক মন রসের জাত বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত নয়, বিভিন্ন রস এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের হাসি মিশে গিয়ে মিশ্ররসের এবং মিশ্র জাতের হাসি সৃষ্টি করে। পরশুরামে বিশুদ্ধ কৌতুক হাস্য আছে, যেমন গুপী সাহেব ও উপেক্ষিতা, জটাধর বকশী পর্যায়কেও এই শ্রেণীতে ধরা উচিত। অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কারের

হাসিই অধিকাংশ গল্পে। অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু বড় চোখে পড়ে না। হাসতে হাসতে কণ্ঠ ব্যাপরুদ্ধ করে তোলে কমলাকান্তের দপ্তরে ও বৈকুণ্ঠের খাতায়। সে হাসির বোধ করি একেবারেই অভাব পরশুরামে। বের্গসঁ যাকে ইন্‌টেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে প'ড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। সেই জন্যে সকলেরই কাছে এর নিত্য সমাদর। অপরপক্ষে অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথের হাসি ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী বিশেষের পক্ষে পীড়াদায়ক। স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজীশিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এই হাসির লক্ষ্য। পরশুরামের হাসির লক্ষ্য Idea, Ideology, কোন কোন বৃত্তি, ব্যবসায়, সাহিত্য ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি। এ হাসির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেকেই মনে করে সে ছাড়া আর সকলে তার লক্ষ্য, কাজেই অসংকোচে হাসতে তার বাধে না। গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া পেন্সনপ্রাপ্ত রায় সাহেব তিনকড়িবাবু, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বিরিঞ্চিবাবা, বকুবাবু, শিহরন সেন অ্যান্ড কোং সকলেই প্রাণ ভরে হাসে, হাঃ হাঃ হাঃ—অমুক লোকটাকে খুব ঠুকেছে দেখছি, মেরে হয়েছে। শেক্সপীয়র নাটককে প্রকৃতির দর্পণ বলেছেন। পরশুরামের দর্পণখানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের অমদানি করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।

হাস্যরস সৃষ্টির একটি চিরাচরিত পন্থা অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশ। সকলকেই অল্পবিস্তর এ পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। এ গুণটিতে পরশুরাম প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত।

সত্যব্রতর উক্তি, "সান্ডেল মশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আর আমি ভাবছি আর সোলা।"

শূর্পণখা বিরহ দুঃখ বর্ণনা করছে এমন সময়ে ভাইঝি পুষ্পকলা জিজ্ঞাসা করে বসে "পিসি, তুমি ঋষি খেয়েছে?"

"নিরুপমা বলিল—শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।"

"নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না।"

"দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ", "ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক", "শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী", "তাঁহারা (নাস্তিকরা) মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন", "লালিমা পাল (পুং)", "তবে এইটুকু আশার কথা, এখনে (দার্জিলিঙ পাহাড়ে) মাঝে মাঝে ধস নামে।" "সার আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন", প্রভৃতি। এমন উদাহরণ শত শত উদ্ধার করা যেতে পারে। এই ধরনের অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশকে এক ধরনের এপিগ্রাম বলা যেতে পারে, প্রভেদের মধ্যে এই যে সাধারণ এপিগ্রাম ভাবময়, এগুলি চিত্রময়। এইসব এপিগ্রামের স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ যেমন মনোহর, তেমনি অত্যাবশ্যক। এরাই পাঠকের মনকে সর্বদা সজাগ করে রেখে দেয়, তার চোখের সম্মুখে পথ দৃশ্যমান ও সুগম হয়ে ওঠে।

॥ ৯ ॥

পরশুরামের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বক্তব্য শেষ করে এবারে গ্রন্থ হিসাবে তাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার আগে বইগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বের কারণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

গড্ডলিকা ও কজ্জলী অধিকাংশ পাঠকের বিবেচনায় পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। একথা সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক এই বিবেচনার কিছু হেতু আছে। প্রথম দু'খানির সঙ্গে শেষের সাতখানির একটি প্রধান পার্থক্য, (অন্য পার্থক্য আগেই দেখানো হয়েছে) প্রথম দু'খানিতে দেখানো হয়েছে জীবনচিত্র, শেষের কয়খানিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীবনতত্ত্ব। প্রথম দু'খানি ছবি, শেষের গুলি ভাষ্য। তবে ছবি ও ভাষ্য, আগে যাকে বলেছি চিত্র ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময়ে একটার মধ্যে আর একটা এসে পড়েছে। তবে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বিচার করলে পার্থক্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ও বিরিঞ্চিবাবা আর তৃতীয়দূতসভা, রামরাজা বা গামানুষ জাতির কথা, একজাতের গল্প নয়। প্রথম দুটোতে লেখক ছবি এঁকেই সন্তুষ্ট, শেষেরগুলোতে ছবির সঙ্গে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন কিংবা বলা উচিত মন্তব্যের সঙ্গে কখনো কখনো জুড়ে দিয়েছেন ছবি। ফানুস ও ঘুড়িতে এই রকম প্রভেদ। ফানুষ হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বাজিকর সম্পূর্ণে দায়মুক্ত, তারপরে ঐ বস্তুটা বাতাসের বেগ ও নিজের ভার অনুসারে চলতে থাকে। ঘুড়ি উড়নদার নিরপেক্ষ নয়, বাতাসের বেগ ও নিজের ভার যাই বলুক, যতই উঁচুতে সে উঠুক, ওর হাতের চরম টানটা পড়ছে উড়নদারের হাত থেকে। লোকটি ভাষ্যকার, ঘুড়ির গতিবিধি তার ভাষ্য। অন্যপক্ষে ফানুষ অনন্যনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত গল্পগুলি জীবনতত্ত্বের বা জীবনভাষ্যের শ্রেষ্ঠ আধার।

এখন পাঠক-সাধারণের কাছে তত্ত্বের চেয়ে চিত্রের আদর বেশি; তাকালেই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তত্ত্ব বুঝতে হলে বুদ্ধির আবশ্যক, সকলে সব সময়ে বুদ্ধি খাটাতে চায় না, বিশেষ গল্প উপন্যাসে, সে গল্প উপন্যাস আবার যদি হাস্যরসাত্মক হয়। কিন্তু বুদ্ধমান পাঠকের কাছে শেষের বইগুলোর আদর কম হওয়ার কথা নয়; লেখকের প্রতিভার সঙ্গে মনীষাকে লাভ করাকে তারা উপরি পাওনা বলে গণ্য করে। শেষের বইগুলির গল্পে সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, যুদ্ধ, শান্তি, প্রেম, নরনারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন আর সেই মন্তব্যের সমর্থনে কখনো বিচিত্র নরনারী ও ঘটনাকে উপস্থিত করেছেন।

তবে উভয় পর্যায়েই ব্যতিক্রম আছে বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের বইগুলির মধ্যে জটাধর বক্‌শী সিরিজ, দুই সিংহ, আনন্দীবাঈ, আতার পায়েস, পরশ পাথর, সরলাক্ষ হোম, জয়হরির জেরা, লক্ষ্মীর বাহন, রাতারাতি, গুরুবিদায় প্রভৃতি জীবনচিত্র-প্রধান গল্প। আবার দুয়ের মিশ্রণে অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি গগন চটি। এটি পরশুরামের অতি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সরস কাহিনীর ফ্রেমের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর ধাপ্পা ও ভণ্ডামিকে সশ্রদ্ধ করে দাঁড় করানো মুনশীয়ানার চরম, গল্পের কলমের পিছনে মনীষার প্রেরণা না থাকলে এমন সম্ভব হতো না।

প্রথম দু'খানির এগারটি গল্পের মধ্যে জাবালি নিঃসন্দেহে জীবতত্ত্ব-প্রধান। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যে-সব গল্প লিখেছেন জাবালি তাদের প্রথম। খুব সম্ভব রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আগ্রহ থেকেই তিনি পেয়েছেন পৌরাণিক কাহিনী পুনরুযোচিত ছাঁচে ঢালাই করবার প্রেরণা। সে যাই হোক এই জাবালিতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে সবিস্তারে বলবো। আপাততঃ অন্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিচার সেরে নেওয়া যেতে পারে।

এগারটি গল্পের জাবালি বাদ পড়লে থাকে দশটি। মহাবিদ্যা ও উলটা-পুরাণ দৃষ্টির অভিনবত্বে, নরনারীর বৈচিত্র্যে এবং wit-এর ঋদ্যোতবর্ষণে চিত্তাকর্ষক হলেও, শক্ত গল্পের ফ্রেমের অভাবে অন্যগুলোর সমকক্ষ হতে পারেনি। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মনোহর, কিন্তু

সমগ্র রূপটি নয়। লেখক যেন দেহের outline-টা আঁকতে ভুলে গিয়েছেন। অন্য আটটি গল্প বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আটটি গল্প।

॥ ১০ ॥

গোড়াতে উল্লেখ করেছি যে রাজশেখর বসুর বিজ্ঞান শিক্ষা (আইনও তার মধ্যে পড়ে) এবং বহুৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছে। সকল লেখককেই করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাকিমী অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর অনেক উপন্যাসে আছে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংগীতবিদ্যার সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়। তাঁর অনেক Image অনেক অলঙ্কার সংগীত-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাজশেখর বসুও কাজে লাগিয়েছেন তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পের কোম্পানীর আইনের রন্ধ্র সন্ধানে যাঁর জ্ঞান পাকা। আবার বিজ্ঞানবিদ্যাও তাঁর কাজে লেগেছে। কুমড়োর চামড়া কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে ভেজিটেবিল শু হলেও হতে পারে এ ধারণা সকলের মাথায় আসবার কথা নয়। আবার বিরিঞ্চিবাবাতে প্রোফেসার ননীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আইডিয়া কেবল তারই মাথায় আসা সম্ভব, বিজ্ঞানের বিশেষ রসায়নের সাধারণ সূত্রগুলি শিনি অবহিত। প্রাণিতত্ত্ব, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতির মূল সূত্রগুলিকে তিনি কাজে প্রয়োগ করেছেন পরবর্তী অনেক গল্পে।

তারপর ১৪ নম্বর পাশীবাগান লেনের আড্ডাটিকে এবং আড্ডাধারীদের অনেককে তিনি নামান্তরে ও রূপান্তরে ব্যবহার করেছেন কেদার চাটুজ্যে গল্পমালায়।

রাজশেখরবাবু স্বীকার করেছেন যে তিনি বেশী লোকের সঙ্গে মেশেন নি, দেশভ্রমণ বেশি করেন নি। প্রতিভাবান লোকের পক্ষে এ প্রয়োজন সব সময়ে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র খুব মিশুক লোক ছিলেন না, দেশভ্রমণও বেশি করেন নি। তবে তাঁর উপন্যাসে এত বিচিত্র নরনারী এলো কোথা থেকে? তাদের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় দিয়েছে দেখা আদালতে এসে। রাজশেখরবাবুর বেলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিসে। বাকিটুকু প্রতিভার রসায়ন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালীর রসায়ন বিদ্যার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।" গরমিলে মেলানোই যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান উপায়। হাস্যরস ফকিরের আলখাল্লা, নানা রঙের কাপড়ের টুকরোয় তৈরী। বেঙ্গল স্কুল অব কেমিস্ট্রির নব্য-রাসায়নিক পরশুরাম সেই নীতিতেই তাঁর হাসির গল্পগুলি সৃষ্টি করেছেন।

এবারে জাবালি। জাবালি চরিত্রটি খুব জনপ্রিয় না হলেও (সেযুগেও জনপ্রিয় ছিলেন না) জাবালি গল্পটি, অতি উৎকৃষ্ট। আর শুধু তাই নয় পরবর্তী অনেক উৎকৃষ্ট পৌরাণিক গল্পের অগ্রজ।

ব্রহ্মা জাবালিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন করো। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাকো।"

স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ সংস্কারের ছিন্নবন্ধন জাবালি মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটা মূর্তিমান প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এর আগে অনেকবার বলেছি পরশুরামের হাস্যরসের বিশেষ প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। পরশুরামের চোখে আদর্শপুরুষ জাবালি। অমরনাথে ও কমলাকান্তে মিলিয়ে নিলে, হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে খানিকটা পাওয়া যায়। তেমনি খুব সম্ভব পরশুরামের ব্যক্তিত্বের খানিকটা পাওয়া যায় জাবালি চরিত্রে। পরশুরামের Symbolic Hero জাবালি। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে বারে বারে পরশুরামের তুলনা করেছি, আবার করা যেতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের চোখে আদর্শপুরুষ মুক্তামালা গল্প পর্যায়ের সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। গড়গড়ি সরল ভাবে স্বীকার করেছে, (যেন অপরাধ স্বীকার) "ভালরূপ লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে সত্য ও পরোপকার, ইহাই ধর্ম।" ত্রৈলোক্যনাথের জীবনেও এই ছিল নীতি ও প্রকৃতি। তাঁর হাসারসের প্রচ্ছন্ন অশ্রুর জগতের Symbolic Hero সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। একজনে ঘনীভূত অশ্রু, অপরজনে ঘনীভূত তিরস্কার। এইভাবে দুইজনে হাসির বর্ণালীর দুই বিপরীত প্রান্ত।

॥ ১১ ॥

এবারে আর গ্রন্থ হিসবে নয় বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে গল্পগুলির আলোচনা করবো। অনেকগুলি পর্যায়ক্রম পরশুরামে আছে, তার মধ্যে পৌরাণিক, কেদার চাটুজ্যে, জটাধর ধর্যায়গুলি প্রধান। অন্য গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও পর্যায়রূপে তাদের তেমন গুরুত্ব নাই, অর্থাৎ এই সব গল্পে পর্যায়ের বিস্তার সঙ্কীর্ণ।

চিত্তাকর্ষকগুণে কেদার চাটুজ্যে ও জটাধার পর্যায়ে অধিক হলেও চিত্তাকর্ষকগুণে পৌরাণিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি। সমাজ রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পরশুরামের চিন্তায় এগুলি বাহন। কত বিষয়ে যে তাঁর কল্পনা প্রসারিত হয়েছে, কত সমস্যা যে তাঁর চিন্তার পরিধির মধ্যে এসে পড়েছে গল্পগুলি সেই পরিচয় বহন করছে।

অনেকের মুখে এমন কথা শোনা যায় যে, পরশুরামের হাতে পড়ে পৌরাণিক নরনারীর বা কাহিনীর অপকর্ষ সাধিত হয়েছে। একথা সত্য নয়, তবে পুরাণের সঙ্গে গল্পগুলির যে ভেদ ঘটে গিয়েছে তা অবশাই সত্য। এ ভেদ কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। পুরাণ-গুলিতে সমস্ত কাহিনী একরূপ নয়, বিভিন্ন পুরাণে একই কাহিনীর রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায়। সেও একই কারণে, কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। কালের ও লেখকের দাবী অনুসারে পরশুরামের হাতে পুরাণের জন্মান্তর ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

রামরাজ্য ও চিরঞ্জীবে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক কালের মিশ্রণ। রামরাজ্য গল্পের মিডিয়াম-রূপে ভূতগ্রস্ত ভূতনাথ যে গভীর সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছে তা কখনোই আধা-মূর্খ ভূতনাথের দ্বারা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত পাঠকের মনে এই সন্দেহটুকু লেখক জাগিয়ে রেখেছেন, পাঠক ভাবতে থাকে তবে কি সত্যই সে ভূতাবিষ্ট হয়েছিল? ভূতনাথ কথিত তত্ত্বগুলিকে সে গ্রহণ করলেও ভূতনাথের নিজস্ব বলে গ্রহণ করতে তার বাধে। এই বাধাটুকু সৃষ্টি খুব মুনশীয়ানার কাজ।

চিরঞ্জীবেও তা-ই। চিরঞ্জীব কে? বিভিষণ ছাড়া আর কে হবে? অথচ স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

গুলবকাওলিস্তান আরব্য-উপন্যাসের উপসংহার, ভারতীয় পুরাণের রূপান্তর নয়, অন্য নামের অভাবে তাকে পৌরাণিক বলেই ধরা উচিত।

দশকরণের বানপ্রস্থে সুখের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশকরন নানা অবস্থার মধ্যে সুখের সন্ধান করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পরের ঘর ছেয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই সুখ নাই, পরোপকারই যথার্থ সুখ। ব্যঙ্গরসিক কমলাকান্তেরও এই সিদ্ধান্ত। অপর দুইজন অতিশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিক বার্নার্ড শ ও ভলটেয়ার শেষ পর্যন্ত এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। Candide এবং Blackgirl's Search for God এই দুই অমর গ্রন্থে এই একই সিদ্ধান্ত। দশকরণ ঘরামী বৃত্তি ছেড়ে সিংহাসনে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

তৃতীয়দূতসভায় দেখানো হয়েছে, অধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ রাজনীতির চিরস্বীকৃত নীতি। এই নীতির প্রেরণাতেই শকুনির ভ্রাতা মৎকুনি যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতের সাহায্য লইতে পরামর্শ দিয়েছেন।

ভীম গীতা গল্পে ভীম কৃষ্ণকে বলেছেন কাপুরুষতা ও ধর্মভীরুতা কোনটাই তার চরিত্রের লক্ষণ নয়; সে মধ্যপন্থী। কাজেই কৃষ্ণ তাঁর উচ্চ আদর্শ নিয়ে থাকুন, ভীম ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য করবে। এই গল্পে চোক্কমল্ল আর তক্কমল্ল নামে কৃষ্ণের দুইজন সেবকের উল্লেখ আছে, তারা নিতান্ত সাধারণ ও দুর্বল ব্যক্তি। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'দুর্বলের একমাত্র উপায় জোটবাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংহীকেও জব্দ করতে পারে।' বর্তমান যুগ এই নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

ভরতের ঝুমঝুমি ভারত বিভাগ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্য।

অগস্ত্যদ্বার রাজাদের জিগীষার মূঢ়তা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্যে পরিপূর্ণ।

বালখিল্যগণের উৎপত্তি চিন্তাশীল মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। লেখকের অভিমত এই যে, বালখিল্যগণের লীলা পৌরাণিক কালেই সীমাবদ্ধ নহে, যুগে যুগে সে লীলা পুনঃঅভিনয় হয়ে থাকে, বর্তমান যুগে সেই লীলার প্রশস্ত আসর।

তিন বিধাতা গল্পে পাপের উৎপত্তি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিবৃতি আছে। লেখকের বক্তব্য এই যে, বিধাতা পাপপুণ্যের অতীত, তাঁর চোখে সবই সমান, মানুষ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলেই পাপপুণ্যের ভেদ করে আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অসীমকালের অধীশ্বর বিধাতা নিরুদ্বিগ্ন। পাপ ও পুণ্য দুই-ই জীবনের অপরিহার্য লক্ষণ। কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবনকে কল্পনা করা চলে না।

গন্ধমাদন-বৈঠকে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ বলে কিছু সম্ভব নহে। যুদ্ধের আগে ধর্মের প্রেরণায় যেমনই নিয়ম বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, যুদ্ধকালে তার ব্যভিচার ঘটবেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্তই এই ব্যভিচারের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। হয় যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করতে হবে, নয় যুদ্ধে অধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে।

নির্মোক নৃত্যে জীবনে একটি গভীর জিজ্ঞাসাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃত সৌন্দর্য রূপাশ্রয়ী নয়, তার স্থান আরও গভীরে। উর্বশীর পরাজয়ে এই সত্যটি দেখানো হয়েছে।

যযাতির জরা গল্পে দেখানো হয়েছে যে, তথাকথিত সন্ন্যাস বাসনার মূলচ্ছেদ করতে অক্ষম। বাসনা যখন রূপসী নারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন সন্ন্যাসের সযত্নরচিত তাসের ঘর মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।

জন্মেজয় পণ্ডিত একজন মূর্খ আদর্শবাদী, তাই কোথাও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি।

আদর্শবাদের সঙ্গে সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধ নেই এই কথাই বোধ করি লেখক বলতে চান।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে, বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। আগেই বলেছি আবার বলতে ক্ষতি নেই, ওই পর্যায়ের আদি ও শ্রেষ্ঠ গল্প জাবালি। শুধু তাই নয় মুক্তমতি সংস্কারমুক্ত জাবালি পরশুরামের Symbolic Hero.

আর একটি পর্যায় আছে যার প্রধান ব্যক্তি কেদার চাটুজ্যে। সে বক্তা ও প্রবক্তা দুই-ই। এই পর্যায়ে লম্বকর্ণ, গুরুবিদায়, রাতারাতি, স্বয়ংবরা, দক্ষিণ রায় ও মহেশের মহাযাত্রা গল্প-গুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অভিযোগে আমরা কোনটি-কেই ছাড়তে রাজী নই। ব্যঙ্গ-সমাজচিত্র হিসাবে এই পর্যায়টিকে পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে অন্যায় হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁতভাবে, নখদর্পণে বিম্বিত। ঘটনাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সর্বোপরি কেদার চাটুজ্যের গল্প-ব্যাখ্যান কি তার তুলনা দেব জানি না। এই বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র কেদার চাটুজ্যেতেই তা সম্ভব। এই গল্পের একটি প্রধান পাত্র লম্বকর্ণকে ভুলি নাই, বংশলোচনবাবুর অনেক অন্ন সে ধ্বংস করেছে এবং গুরুবিদায় গল্পে নিজের কীর্তি দ্বারা সমস্ত অন্নঋণ শোধ করে দিয়েছে।

জটাধর বক্‌শী সিরিজের তিনটি গল্প। জটাধর বক্‌শী ভণ্ড ও জোচ্চোর। কিন্তু হলে কি হয়, তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও সপ্রতিভ ভাব তার উপরে কাউকেই রাগ করতে দেয় না। চাঙ্গায়নি সুধা সমূল্যে বিতরণ করে যখন সে সকার্য সিদ্ধি করছে, তখনও তার উপরে রাগ করা অসম্ভব। যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে সে পকেট মারছে, তখনও মনে হয় যা করছে করুক কেবল আর কিছুক্ষণ কথা বলুক, তার কথাবার্তাতেই চাঙ্গায়নি সুধার উন্মাদক শক্তি বিদ্যমান। ডিকেন্স যে সব প্রতিভাবান জোচ্চোর সৃষ্টি করেছেন, তাদের সঙ্গে বেশ মিলত জটাধর বক্‌শীর।

মাঙ্গালিক ও গামানুষ জাতির কথা গল্প দুটিতে চরিত্রগুলি ঠিক মানুষ নয়। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত ব্যক্তি মাঙ্গালিক, তার চোখে পৃথিবীর সমস্তই অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক। গামানুষ জাতির কথার পাত্রগুলি মানুষ নয়, মানুষ বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, এরা গেড়ায় ছিল ইঁদুর এখন আর্ণবিক রশ্মির প্রভাবে একপ্রকার, অন্য শব্দের অভাবে মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কি বলব, মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এদেরই বিচিত্র ইতিহাস এই গল্পে।

বিশুদ্ধ আদর্শবাদের প্রতি, যে আদর্শবাদ শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, পরশুরামের অনু-কম্পা মিশ্রিত হাস্যের ভাব আছে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর, নিধিরামের নির্বন্ধ, অক্রূর সংবাদ, অটলবাবুর আত্মচিন্তা ও সিদ্ধিনাথের প্রলাপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর ও নিধিরাম অবিমিশ্র সৎ প্রকৃতির লোক, খাঁটি আদর্শবাদী। কাজেই তাদের পরিণাম দুঃখের। আদর্শবাদ ও পাগলামি যে কোন কোন সময়ে অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, অক্রূর সংবাদ তার একটি উদাহরণ। আবার অনেক সময়ে আদর্শবাদ মানুষকে যে নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে যায়, অটলবাবুর আত্মচিন্তা তার একটি উদাহরণ। মোটকথা এই যে, আদর্শবাদকে পরশুরাম অশ্রদ্ধা করেন না কিন্তু সেই আদর্শবাদ যখন একান্ত হয়ে উঠে কাণ্ডজ্ঞানকে বর্জন করে, তখন তাকে ব্যঙ্গের উপকরণরূপে গ্রহণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। আদর্শবাদের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান মিশ্রিত হলে তবেই তা কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। বোধ করি এই তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

ব্যঙ্গ-লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। সুইফট্, বার্নার্ড শ ও ভলটেয়ার মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মধুর রসের কাহিনী লিখতে পারেন নি। এমন কেন হয় সহজেই অনুমেয়। ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবতই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে? ও দুয়ে ধর্মের মূলগত প্রভেদ। অন্য-পক্ষে লিরিক কবি, প্রেম যাদের প্রধান উপজীব্য তাদের হাতের ব্যঙ্গের কলমের গতি বড় সুষ্ঠু নয়। শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ। ব্যতিক্রম বায়রণ ও হায়নে। কীটস সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, কাব্যের কোন ক্ষেত্রে তার যে প্রবেশ অনধিকার ছিল এমন মনে হয় না।

পরশুরামের ব্যঙ্গদৃষ্টি ব্যঙ্গের স্বাভাবিক উপাদানের দিকে নিবদ্ধ হলেও সৌভাগ্যবশতঃ কখনো কখনো প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তার রচিত প্রেমের গল্প সংখ্যায় সামান্য কয়টি, তার উপরে আবার তাতে প্রেমের উন্মাদনা নেই, এমন কি প্রথম নজরে অনেক সময়ে সেগুলি যে প্রেমের গল্প তা খেয়াল হয় না। তবু সেগুলি প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, আর এই স্বল্প-সংখ্যকের কয়েকটি পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্তর্গত। আনন্দীবাঈ, যশোমতী, রটন্তীকুমার, চিঠিবাজি, জয়হরির জেরা, নীলতারা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গল্প-গুলিতে প্রেমের প্রকৃতি আবার এক রকম নয়।

আনন্দীবাঈ গল্পে প্রেম দাম্পত্য সম্বন্ধের সার্থকতা লাভ করেছে।

যশোমতীতে কিশোর-কিশোরীর প্রণয় দীর্ঘ কাল-সমুদ্র ডুব সাঁতারে পার হয়ে যখন আবার মুখোমুখী হল তখন পাত্র বৃদ্ধ, পাত্রী বৃদ্ধা ও পিতামহী। তারা একদিন প্রেমকে দেখেছিল পূর্বাচলের তীর থেকে আজ দেখলো অস্তাচলের তীরে এসে, মাঝখানে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ। তাদের চোখে অস্তাচলের দৃশ্যও কম মনোরম নয় কেননা তা পলে পলে পুরাতন হয়ে যাওয়ার দুর্ভাগ্য এড়াতে সমর্থ হয়েছে। প্রেমের উত্তাল সমুদ্র এখন তুষারে শুভ্র ও শান্ত, তাই বলে তার সৌন্দর্য অল্প নয়।

রটন্তীকুমারে ধনী পাত্রের সঙ্গে দরিদ্র পাত্রীর কোর্টশিপ বড় নিপুণভাবে, বড় সুকুমার ভাবে, বড় আত্মসম্মান রক্ষা করে অঙ্কিত হয়েছে।

চিঠিবাজিতে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে পরীক্ষা করে নিয়েছে। এ প্রেম একটু Intellectual, তাই বলে Emotion-এ কমতি পড়েনি। দু'জনের বাসরের সংলাপটুকু পড়লেই আর সন্দেহ থাকে না।

নীলতারাতে পথভ্রান্ত প্রেম শেষ পর্যন্ত স্বস্থানে এসে মিলিত হয়েছে।

জয়হরির জেরা প্রায় Taming of the Shrew। অদৃষ্টের আঘাতে বেতসী খঞ্জিনী হয়েছে। ঐটুকুর প্রয়োজন ছিল খঞ্জ জয়হরির অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার জন্যে।

গল্পগুলি প্রেমের নিঃসন্দেহ, তবে সে-সব গল্পে যে মামুলী উপাদান ও মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ থাকে তা একেবারেই নেই, কিন্তু মানব স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এগুলি পরশুরামের দক্ষিণ হস্তের রচনা, তবে মননের রেখা গভীর নয়, রঙটাও হাল্কা।

॥ ১৩ ॥

আর কয়েকটি গল্প আছে যাদের কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবু তাদের মধ্যে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভুষণ পাল ও দাঁড়কাগ গল্প দুটিতে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর আভাস

বিদ্যমান। পরশুরামে প্রচ্ছন্ন অশ্রু বিরল বলেই গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামা নামান্তরে তমিস্রা নামান্তরে দাঁড়কাগ বা কোয়া দিদি নিজের রূপহীনতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এ বিষয়ে কোন মেয়ে সচেতন অর্থাৎ নিঃসন্দেহ হলে তার মন বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হতে বাধ্য, চরাচরের ষড়যন্ত্রেই এমনটি হয়েছে বলে তার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। কোয়াদিদি কিন্তু ঐ বিশ্বাসের ফাঁদে পা দেয়নি; বিদ্বেষকে নিজের বিরুদ্ধে আরোপ করে নিজেকে নিয়ে সে ঠাট্টা করতে পারে। এ কাজ যে পারে তাকে আঘাত করা কঠিন। কোয়াদিদি অশ্রুকে জমিয়ে আইসক্রীমে পরিণত করেছে, তার উপরে হাসির সূর্যকিরণ পড়ে বড় মনোহর দেখাচ্ছে।

ভূষণ পাল এমনি আর একটি প্রচ্ছন্ন অশ্রু (অনতিপ্রচ্ছন্ন) কাহিনী। খুনী, আসামী ফাঁসির বলি। এমন লোকের মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকতে পারে এখানে সেটাই অত্যন্ত সহজে দেখানো হয়েছে। অপটু লেখকের হাতে পড়লে চোখের জলের ঢেউ বয়ে যেতো, এখানে গোটা-দুই চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মাত্র শ্রুত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি গল্পে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য কোন প্রকার অশ্রু থাকবার কথা নয়, তবু প্রচ্ছন্ন অশ্রুর তালিকায় গল্পটির নাম লিখতে ইচ্ছে করে। গল্পটি শিউলি ফুলের মতো সুকুমার ও স্পর্শ-কাতর, এর মধ্যে কোথায় যে গল্প বুদ্ধি বুঝতে অক্ষম। শিউলি ফুলে যদি শিশিরের আভাস থাকে, তবে এ গল্পটিতেও অশ্রুর আভাস আছে।

॥ ১৪ ॥

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে অনেক গূঢ়ার্থ ব্যঙ্গ মন্তব্য পরশুরামের বিভিন্ন গল্পে ছড়ানো আছে সত্য, কিন্তু সরাসরি বিষয়টি নিয়ে লিখিত গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। দুই সিংহ, রামধনের বৈরাগ্য, বটেশ্বরের অবদান ও দ্বান্দ্বিক কবিতা গল্প কয়টিকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয় বলা যেতে পারে।

দুই সিংহ সাহিত্যিকের আত্মম্ভরিতায় হাস্যকর। রামধনের বৈরাগ্য এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের মনোভাব সম্বন্ধে এবং বটেশ্বরের অবদান এক শ্রেণীর পাঠকের উপরে সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যঙ্গচিত্র। দ্বান্দ্বিক কবিতা এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের পরিণাম সম্বন্ধীয় সরস বিবরণ।

১৯২২-এ প্রথম গল্প প্রকাশের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরশুরামের যে গল্পধারা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বাঙালীর সামাজিক পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত। গন্ডলিকা ও কজ্জলীর গল্পগুলিতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও তৎপরবর্তী অশান্ত অবস্থা রামরাজ্য, শোনা কথা, বালখিল্যগণের উৎপত্তি, গগন চটি, মাৎস্য ন্যায়, ভীম গীতা প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত। কালান্তরে অবস্থান্তর ব্যঙ্গ-রসিকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

পর্যায়ক্রমে আলোচিত গল্পগুলির বাইরে এমন অনেকগুলি গল্প আছে যা পরশুরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে। লক্ষ্মীর বাহন, পরশ পাথর, বরনারীবরণ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, চিকিৎসা-সংকট, ভুশণ্ডীর মাঠে, কচি-সংসদ, বিরিঞ্চিবাবা, কাশীনাথের জন্মান্তর প্রভৃতি ব্যঙ্গরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

॥ ১৫ ॥

এবারে উপসংহার। আমাদের যা বক্তব্য প্রবন্ধ মধ্যে নানা প্রসঙ্গে তা কথিত হয়েছে। উপসংহারে সেই সব পুরানো কথা দু-একটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রধান কথাটা এই যে, ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে পরশুরামের একমাত্র দোসর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রচনার পরিমাণে, শ্রেণীভেদ ও বৈচিত্র্যে ত্রৈলোক্যনাথ বোধ করি পরশুরামের উপর। আবার রচনার সূক্ষ্মতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধির অনুশীলনে পরশুরামের শ্রেষ্ঠতা। কঙ্কাবতীর মত উপন্যাস পরশুরাম লেখেন নি। কঙ্কাবতী উপন্যাসখানিকে অবলম্বন করলে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পরশুরামের ক্ষেত্রে সেরকম কোন অবলম্বন নেই, অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশটি গল্পকে গ্রহণ না করলে তাঁর মোটামুটি পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। গল্প-লেখকের পক্ষে এ এক মস্ত অসুবিধে। দুজনেই উচ্চ-পার্টীয়ান্ স্রষ্টা, তবে দুয়ে প্রভেদ আছে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা, পরশুরামের প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ঘেঁষা, ব্যতিক্রম দুই ক্ষেত্রেই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির উদ্ভব ও পরিবেশ গ্রামাঞ্চল, পরশুরামের কলকাতা শহর। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে। উদ্ভব ও পরিবেশের ভেদে দুজনের গল্পের বিষয়, মনোভাব ও টেকনিকে ভেদ ঘটেছে। পরশুরামের অসুবিধে এই যে বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলকে তিনি জানেন না বললেই হয়। না জানুন তাতে ক্ষতি নেই, কলকাতা শহরের অনেক পথঘাট ও বিভিন্ন অঞ্চলকে সাহিত্যে তিনি স্থায়ীভাবে চিত্রিত করে গিয়েছেন, সেই সব চিত্রে পাঠক বাস্তবের অতিরিক্ত কিছু পায়, ফলে কলকাতা শহর ব্যঙ্গের বিষয়বস্তুরূপে কিছু পরিমাণে সত্যতর হয়ে ওঠে। আজ একশো বছরের উপরে বাঙালী সাহিত্যিকগণ কলকাতা শহরকে সাহিত্যের মানচিত্রে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন, দুজনের বিষয় প্রধান সাহিত্যিকত্রয় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তেমন কেউ মন দেননি। তাঁদের রচনায় বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চল সত্যতর হয়ে উঠেছে। ডিকেন্স লন্ডন শহরের জন্য যা করেছেন, কলকাতা শহরের জন্যে এখনও কেউ তা করেন নি। কলকাতা শহরের ডিকেন্স এখনও ভবিতব্যের গর্ভে। পরশুরামের রচনায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে এ চেষ্টা আছে। তিনি প্রতিভায়, পরিচয়ে ও স্বভাবে Urban বা নাগরিক। সেই জন্য তাঁর রচনা ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে অনেক বেশী মার্জিত, অনুশীলিত ও ভব্যতাযুক্ত। অন্যপক্ষে সৃষ্টির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ত্রৈলোক্যনাথে বেশী। তবে দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে পরিপূরক মনে করাই অধিকতর সংগত। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও নগরপ্রধান কলকাতা শহরকে যেন একত্রে পাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সৌভাগ্য। দুজন গড়গড়ি ও জাবালি যতই ভিন্নস্তরের ব্যক্তি হোক এক জায়গায় দুজনের মিল আছে। একজন জন্ম দিয়ে, অপরজন বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেউই স্থিতা-বস্থাকে স্বীকার করে নেন নি। এদের দুজনকে ব্যঙ্গ-রসিকদ্বয়। Symbolic Hero বলেছে, ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পাঠকের সম্মুখে এনে দিয়ে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

॥ ১৬ ॥

রাজশেখর বসু স্বনামে অনেকগুলি বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রধান চলন্তিকা অভিধান এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ।

সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় অভিধানের অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও চলন্তিকা অপরিহার্য। প্রথম কারণ, এর আয়তন বিভীষিকা ব্যঞ্জক নহে, যে সব শব্দ সাহিত্য ও সংলাপে নিত্য চলে চলন্তিকায় তাদেরই সংযোগ। দ্বিতীয় কারণ, বাংলাভাষা, বানান ও বানান-চিহ্নে অরাজকতার মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা আছে। তৃতীয় কারণ, পরিশিষ্ট প্রদত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিভাষা সংকলন। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থাৎ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র এবং প্রুফ-রিডারদের পক্ষে চলন্তিকা অপরিহার্য সঙ্গী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিধানের স্থান আলমারিতে, চলন্তিকার স্থান লেখার টেবিলের উপরে। অভিধানের পক্ষে এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হতে পারে জানি না। শুধু এই বইখানা লিখলেই রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

কোন বৃহৎগ্রন্থের সংক্ষেপণ একপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য। সে গ্রন্থ আবার যদি মহৎ হয়, তবে এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যবায়ের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, কিন্তু রাজশেখর বসু প্রত্যবায়গ্রস্ত হননি তার কারণ রামায়ণ মহাভারত তথা প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার প্রেরণাতেই তিনি রামায়ণ মহাভারতকে নবকলেবর দান করেছেন। মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ, কাজেই এখানে কার্যটি দুষ্কর হয়নি। মূল কাহিনীকে সহজ বাহ্য আকারে তিনি লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। মহাভারতের ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা তর্কাতীত নয়।

কাহিনী, উপকাহিনী, উপদেশ ও অনুশাসনে গঠিত মূল মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক। এ হেন তিমিঙ্গিল মহাগ্রন্থকে আট শ পৃষ্ঠার মধ্যে আনয়ন অসম্ভব বলেই মনে করতাম, যদি না রাজশেখর বসু হাতেকলমে তা সম্পন্ন করতেন। তাঁর এ কাজ তর্কাতীত না হতে পারে, তবে আদৌ যে সম্ভব হয়েছে তাই বিস্ময়কর। যাই হোক এই দুই অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থকে সহজায়ত্ত করে দিয়ে তিনি বাঙালীর মহৎ উপকার সাধন করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ইলিয়ডের মত ক্লাসিক গ্রন্থকে মূলভাষায় পাঠ করার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না, সকলের পক্ষে তো কখনই হয় না, এদের মহত্ত্ব এমন আন্তরিক যে ভাষান্তরে পাঠ করলেও তার স্বাদ লাভ করতে পারে পাঠকে। এই ভাবেই এই সব কাব্য চিরকাল পরিজ্ঞাত হয়ে আসছে। রাজশেখর বসু প্রদত্ত নবকলেবর সেই পরিজ্ঞপ্তির বিস্তারসাধন করে বাঙালী পাঠকের সম্মুখে আর একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছে।

গড্ডলিকা

মহানগর : 'ভয়াবহ বিস্ময়কর সংগীত'

সোহিনী ঘোষ

১

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের—আমি কবি যত ইতরের"

এমনতরো ঘোষণাতেই চিনে নেওয়া যায় লেখকের জাত—কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৩-১৯৮৮) কাব্য সাধনার যে ধারা, তাকে পরিচয় করিয়েছিলেন তিনি নিজেই, কোনো সমালোচকের প্রয়োজন পড়ে নি। তাঁর কাব্য সাধনার উদ্দেশ্য, তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার থেকে দূরবর্তী যে নয়—তার পরিচয়ও রেখেছেন স্পষ্ট। 'কল্লোল'-এর সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে নিজের মধ্যে ধারণ করে প্রকাশ করেছেন। 'কল্লোল'এর লেখক বলে যাঁরা চিহ্নিত, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদেরই অন্যতম। 'কল্লোল'-এর সেই চিহ্নকেই তিনি বহন করেছেন আমৃত্যু। "আমি কবি যত ইতরের"—এই দাম্ভিক স্পর্ধিত ঘোষণা অবনমিত হয় নি কখনও।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি পরিচয়ের বাইরেও আরো যে সব পরিচয় ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল গল্পকার পরিচয়। গল্প নয়, 'কল্লোল'-এ প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর গল্পের সমালোচনা। তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' (চৈত্র, ১৩৩০) পত্রিকায়। তারই সমালোচনা করে 'কল্লোল'-এ দীনেশরঞ্জন দাশ লিখেছিলেন—"একটি কেরানী যুবক ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া এই গল্প। এই দুইটি মানুষের প্রেম ও স্পৃহার মধ্যে কোন আবিলতা নাই।...কালক্রমে স্ত্রীকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও স্বামী তাহার নিবিড় প্রেমকে ঘটা করিয়া হা-হুতাশ করিতে দেয় নাই। স্ত্রীও স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে যে কতখানি কষ্ট পাইতেছিল তাহা তাহার একটি কথায় শেষ দিকে বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে" (বৈশাখ, ১৩৩১)। পরে আরো দু একটি গল্পের সমালোচনা 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হলে প্রেমেন্দ্র সাহস করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে 'কল্লোল' অফিসে যান। ১৩৩১ এর শ্রাবণ সংখ্যা থেকে তাঁর লেখা নিয়মিত 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বুঝতে তাঁর 'কল্লোল'-সংযোগ বোঝা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩৩০-এ। তার অন্তিম সংখ্যার প্রকাশকাল পৌষ ১৩৩৬। মাত্র ক'বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে তৃতীয়বর্ষের শুরুতেই মুরলীধর বসুর আগ্রহে ও উদ্যোগে 'কালি কলম' প্রকাশ পায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন। 'কালিকলম' এর আদর্শগত ঐতিহ্যের কোনো বদল ঘটল না— কল্লোলের উত্তরাধিকার স্বীকার করেই তার প্রকাশ ঘটল। 'কালিকলম'-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথমে এবং তৃতীয় বর্ষের প্রথমে যথাক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ

সম্পাদনার দায় থেকে ইস্তফা দেন ও 'কল্লোল'-এর সঙ্গে পুনঃ সংযুক্ত হন। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর আদর্শগত কোনো প্রভেদ ছিল না—একথা আগেই বলেছি, ফলে মধ্যবর্তী দু-এক বছরের জন্য প্রেমেন্দ্র'র রচনার কোনো চরিত্রগত পার্থক্য ঘটেনি। যে দুঃসহ স্পর্ধা এবং নতুন পথ খোঁজার আকুল আগ্রহ 'কল্লোল'-এর লেখক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞান ছিল— সেই বৈশিষ্ট্যকে জীবনের উপান্ত পর্যন্ত টেনেছেন প্রেমেন্দ্র। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—

"পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র-তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!"

('আবিষ্কার' : কল্লোল : কার্তিক, ১৩৩৬)

অচিন্ত্যকুমারের এই লেখাকেই 'কল্লোল'-এর নিশ্চিত চিহ্ন বলে নির্ধারণ করা যায়। আর তাই বোঝা যায় গত শতকের তিরিশের দশক কেন নতুনতর সাহিত্যিক উদ্দীপনায় চঞ্চল ছিল। 'রবীন্দ্র ঠাকুর'কে অস্বীকার না করেও "আপন চক্ষের থেকে" "তীব্র-তীক্ষ্ণ আলো" যে জ্বালানো সম্ভব, এমন আলো যাতে "যুগ-সূর্য-ম্লান" হয়ে যায়—এমন 'অচিন্ত্যনীয়' বিশ্বাস ও স্পর্ধাতেই 'কল্লোল'রা মেতেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই মাতনের সহযোগী করে নিতে পেরেছিলেন বাঙালি পাঠককে। বাঙালির সাহিত্যচর্চার তথাকথিত শিখর 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী' যথাক্রমে ষাট, পঞ্চাশ ও পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে যথানিয়মে অবসিত হয়েছে। পাশাপাশি 'কল্লোল'-এর সমাপ্তি মাত্রই সাত বছরের মধ্যে—শৈশবেই বলা যায়। তবু 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী'র অবসানে যা পাওয়া যায় নি, 'কল্লোল'-এর অপ্রকাশে তা দেখা গেল। বাংলা সাহিত্যের মহারথীদের হাহাকার! (দ্রষ্টব্য : (১) 'কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাস' : 'কালের পুতুল' : বুদ্ধদেব বসু; (২) 'কল্লোল যুগ' : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প আলোচনার শুরুতে 'কল্লোল' সম্পর্কে এ আলোচনা করতেই হলো—না হলে লেখকের প্রতি সুবিচার সম্ভব হয় না। কিন্তু 'কল্লোল'ই প্রেমেন্দ্রর একমাত্র পরিচয় নয়। বিভিন্ন ধরনের জীবিকা গ্রহণের ফল তাঁর সাহিত্যে, বিশেষত গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। কখনও স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারীর কাজ, বেঙ্গল ইমিউনিটিতে বিজ্ঞাপন বিভাগের প্রচার সচিবের কাজ, 'কালিকলম'-'রংমশাল'-'নবশক্তি' সম্পাদনার কাজ। এরপর দীর্ঘ উনিশ কুড়ি বছর ধরে চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগ, পরে আকাশবাণীর প্রোগ্রাম প্রোডিউসার পদে অভিষেক এবং শেষপর্যন্ত ১৯৬২ সালের পর থেকে আমৃত্যু কেবল সাহিত্যচর্চা। এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলি। প্রেমেন্দ্রর জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রগুলি যদি বিবেচনার মধ্যে আনা যায়, তবে দেখা যাবে যে প্রতিটি ক্ষেত্র তাঁকে বিভিন্ন মানুষের সাহচর্য দিয়েছে। যে সব মানুষ সাধারণত মধ্যবিত্ত এবং তার সঙ্গে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত। গল্প প্রকাশের ধারাবাহিকতা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব না হলেও—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়

যে প্রেমেন্দ্রর গল্পে চলাচল করেছে যে চরিত্রগুলি তারা নিতান্তই বঙ্গদেশের উৎপাদন। তাঁর গল্পের ক্ষেত্র তৈরি করতে বা চরিত্র নির্মাণ করতে কোনো ফ্রয়েড বা ইয়ুং, ফ্লুবেয়র বা জোলার প্রয়োজন হয়নি। বরং রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-প্রমথ চৌধুরীর পর বাংলা ছোটগল্প নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শৈলবালা ঘোষজায়ার যে ক্ষেত্র নির্মাণ, যাতে সারজল জুগিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক ত্রয়ী, যার সঙ্গে সংযুক্তি ঘটেছিল জগদীশ গুপ্তের ধারালো বাঁকা কাস্তের—তার থেকেই ফসল তুলেছেন প্রেমেন্দ্র। তাই প্রেমেন্দ্রর গল্পে 'কল্লোল'-এর সেই ধারাটিরই সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে জীবনের স্রোত, যেখানে ভাগ্য ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে মুমূর্ষু মানুষ লড়াই করে ফেরে। ক্লেদাক্ত দিক দেখান নি প্রেমেন্দ্র এমন নয়—কিন্তু জীবন যে ক্লেদ সর্বস্ব নয়—সে বিশ্বাসও তাঁর ছিল। 'কল্লোল'-এর উত্তরাধিকার নিঃসন্দেহে বহন করেছেন তিনি, তবু ভাষা ব্যবহারে সংযত ও ব্যঞ্জনাধর্মী। আর এখানেই গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের বৈশিষ্ট্য।

২

"আমার সঙ্গে চলো মহানগরে—যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দির-চূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।

এ মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত—ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।"

গল্প শুরু হয় কবিতার মতো গদ্য দিয়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি মন যেন গল্প নয়, সংগীত রচনা করতে চায়। যদিও বলেন—"এ সংগীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি—"। বোঝা যায় কাব্যের আড়ালে উঁকি দিতে চাইছে কঠোর গদ্য। গল্পের নামকরণ এবং সূচনা অংশ থেকে হঠাৎ মনে হয় কাহিনি বোনা হবে মহানগর নিয়েই—যে কাহিনি 'ভয়াবহ', বিস্ময়কর'। কিন্তু অচিরেই পাঠক বুঝবেন কাহিনি আসলে মহানগরের নয়—রতনের, তাও খুব শক্ত বুননে তাকে দাঁড় করানো যায় নি। তবু কেন 'মহানগর'? এ প্রশ্ন জাগা বিচিত্র নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র খুব অসচেতন শিল্পী ছিলেন একথা সমালোচকরা বলেন না। তবে কেন 'মহানগর' নামের আড়ালে রতনের গল্প বলা! যে রতনও এমনকি মহানগরে বহিরাগত? প্রেমেন্দ্র মিত্র আদ্যন্ত নাগরিক মননের অধিকারী। আলোচ্য গল্পে মহানগরের স্পষ্ট পরিচয় আছে। এ মহানগর—কলকাতা উল্টোডিঙ্গির প্রসঙ্গে তা অতি স্পষ্ট। কলকাতাকে 'আমার শহর' বলে চিহ্নিত করেছিলেন প্রেমেন্দ্র—তাঁর কবিতায়। তাই বুঝি কলকাতা বারবার উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। "কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সুচিচিত্র"—লেখকের গল্প "সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রের অনুবাদ"। লেখক জানেন সে অনুবাদে তৃপ্ত নাও হতে পারেন পাঠক। তবু গল্প নাম 'মহানগর'।

কাহিনির শুরুতেই পোনাঘাট, পোনার পাইকারি বাজারের সূত্রে উন্মোচিত হয়ে যায়

নগরের অন্তর্চিত্র। সমস্ত নগরটাই একটা খোলাবাজার। নির্মম উদাসীনতায় সেখানে পিষ্ট হয় কোমলতা। আশ্চর্য, পোনার পাইকারি বাজারের মধ্যেই ফুলে ফুলে ভরে থাকে এক কদম গাছ। রতন পোনার নৌকা থেকে নেমে দাঁড়ায় তারই নিচে। মহানগরে রতনের প্রাথমিক আশ্রয়। কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোঁটা ফুল ঝরে পড়ে মাটিতে। পদদলিত করে চলে যায় ব্যাপারী ও ক্রেতা। "পোনা-চারার হাটে কদমফুলের কদর নেই"। উদাসীন ব্যাপারী বা ক্রেতা কদমের নিচেই মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীর ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদমের রেণু মিলে মিশে যায়। রতন দেখে। মহানগরের উদাসীনতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রতন। নাগরিক নির্মম বাজারি মনকে ছুঁয়ে ফেলে অজান্তেই। রতনের এটাই একমাত্র দেখা নয়। নগরকে রতন দেখতে শুরু করেছিল আগের রাত থেকেই। অমাবস্যার রাতে নৌকোর ভেতর থেকে দেখেছিল কেমন করে তারাভরা আকাশ নেমে এসেছে মাটিতে। আলো ছেটানো নগরকে রতন দেখেছে নদীর বুকে ভেসে থাকতে থাকতে—বিস্ময়ে নিশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এলে জটিল অরণ্যের মত জাহাজের মাস্তুল থেকে অজগরের মত নোঙরের শেকল দেখতে পায় রতন। দেখে বিশাল কোনো জলচরের শাবকের মত গাদাগাদি করে থাকা গাধা বোটের জটলা। নদীর দুধারে কলকারখানার বিশাল বিশাল লৌহবাহু দেখে রতন বোঝে এই মহানগর। যেখানে সে খুঁজতে এসেছে তার হারিয়ে যাওয়া ধনকে, যেখানে সে হারিয়ে ফেলবে তার সরল শৈশবকে।

'দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'মহানগর' প্রকাশিত হয়েছিল (২৪ নভেম্বর, ১৯৩৩)। 'মহানগর' কাহিনি সর্বস্ব গল্প নয়। এখানে নেই কোনো আঘাত-সংঘাতের পরিচয়। পেঁয়াজের খোসার মত ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছোনো যায়, সেখানে নেই কোনো শক্ত বীজ—সেও শেষ পর্যন্ত নরম পেঁয়াজেরই একটা অংশ। মাতৃহীন ছোট্ট রতন তার হারিয়ে যাওয়া দিদিকে খুঁজতে আসে নগর কলকাতায়, খুঁজে পায় এবং না নিয়েই ফিরে যায়। এই কাহিনির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। বালক রতন না জানলেও পাঠক আগেই জেনে যান 'দিদি'র অবস্থা ও অবস্থান। ফলে গল্পে কোনো নাটকীয় উপাদানও নেই সে অর্থে। সম্ভবত অমাবস্যার রাতে আলোয় সাজা কলকাতা, ভোরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এবং কুয়াশা সরে গেলে কঠিন কলকাতা, ফুলের রেণু আর মরা মাছে মাখামাখি কলকাতা—আগেই কোমল মানবতার বিপরীতে কঠিন নিষ্ঠুরতাকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল—তাই রতন ও তার দিদির সাক্ষাতে আলাদা কোনো চমক থাকে না। আসলে প্রকৃত অর্থে এ গল্প কোনো রতনের গল্প নয়, নয় তার দিদির গল্প। এ হলো অজগরের গ্রাসে হারিয়ে যাওয়া মানবতার গল্প। আর তাই গল্পের শেষে "মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।" যে গল্প তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা আসলে মহানাগরিক মহাকাব্যের ভগ্নাংশ মাত্র—"তার কাহিনী-সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ।" তিনি জানতেন "মহাসংগীতের স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাতে মেটাবার নয়"। আর জানতেন বলেই রতন বা তার দিদির নাম বা সাক্ষাৎ বা ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ করতে তার বেঁধেছে—সবার ওপর স্থান দিয়েছেন ঘটনার স্থানকে—নামও দিয়েছেন তাই।

৩

তবু এ রতনের গল্প। আর রতনের গল্প বলেই অসামান্য সংযম দেখিয়েছেন লেখক কাহিনির বুননে। সামান্য খানিকটা বিবৃতির অংশ ছেড়ে দিলে সমস্ত গল্পটাই দেখানো হয়েছে রতনের চোখে। মাতৃহীন ভাইকে মমতা আর ভালোবাসার আশ্রয়ে আগলে রাখে যে দিদি, সামাজিকতার অমোঘ নিয়মে তার বিবাহ হয়ে যায়। দিদির আশ্রয় ছাড়া আর কিছু জানা ছিল না রতনের—তাই ফিরে ফিরে সে আশ্রয়ই খোঁজে সে। নতুন কুটুম্বিতার অর্থ-শর্ত-মাত্রা কিছুই না রেখে অবোধ বালক বারবার উপস্থিত হয় দিদির শ্বশুরবাড়িতে। বারবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় তাকে। তারপর একবার যেন কি হয়—রতন বোঝে না—দিদিকে পাওয়া যায় না আর। আকুল রতন, তার পরিবার, পরিজন, সকলেই খোঁজ করে ফেরে দিদির। তারপর রতন শোনে অনেক দূরের দেশ থেকে পাওয়া গেছে দিদিকে—পুলিশ উদ্ধার করে এনেছে। এরপরই ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা। দিদিকে যখন উদ্ধার করে পুলিশ—তখনই যেন দিদি হারিয়ে যায় সত্যি সত্যি। আর কেউ তার খোঁজ করে না, ফিরিয়ে আনে না—বড়দের স্বরচাপা আলোচনায় কি যেন কি রহস্য ধরা পড়ে, রতন বোঝে না—সে কেবল দিদির জন্য আকুল হয়। সে শোনে মহানগর তার দিদির আশ্রয়। সে আসে মহানগরে, দিদিকে খুঁজতে। অবিশ্বাস্য অকল্পনীয়তায় শেষ পর্যন্ত সে তার দিদিকে খুঁজে পায়। কিন্তু তার চাওয়া পূর্ণ হয় না। সে থাকতে পারে না দিদির কাছে, ফিরে আসতে হয় তাকে ব্যথাহত হৃদয়ে। ফিরে আসতে আসতে কি যেন সে বোঝে—আবার ফেরে, তার মুখ বদলে যায়। ভাইকে বিদায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চপলা, রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে—"বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না!" দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন তার মুখে। রতন ফেরে, ফেরে তার বাবার কাছে যাবে বলে, কিন্তু তার চলন বলে—আর সে ছোট নেই।

যেভাবে এই গল্পে রতনকে দেখানো হয়েছে—তাতে তাকে বালক বলেই মনে হয়। যদিও তাকে শিশু বলেই উল্লেখ করা হয়েছে গল্পে। চমৎকার এক শিল্পরীতি অনুসরণ করা হয়েছে গল্পে। রতনের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে গ্রাম ও শহর, ক্রেতা ও ব্যাপারী, পোনার ব্যবসা ও দেহ-ব্যবসার বাজার। বালকের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে বলেই যেন দৃষ্টিটা মাটির অনেক কাছাকাছি। রতনের বাস্তবতাবোধ বড়দের সঙ্গে মেলে না, মেলে না বলেই সে পোনাঘাটেও কদমরেণুর অমর্যাদা বুঝতে পারে। দিদি যখন তাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে চায়, রাখতে চায় না নিজের কাছে, তখন অভিমানাহত হৃদয়ে ফিরে যেতে যেতেও ঘুরে দাঁড়ায় সে, পোনার হাটে কদমের প্রকৃত অমর্যাদা বুঝতে পেরেই। ঝরে পড়া কদমকে কাদা থেকে তুলে নিতে চায়। প্রতিজ্ঞা করে বড়ো হয়ে সে উদ্ধার করবে দিদিকে, নিয়ে যাবে নিজের কাছে, কারো কথা শুনবে না।

ছোটো ভাইটির হঠাৎ এই বড় হয়ে যাওয়া কি বুঝতে পারে চপলা? বোঝা যায় না। সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক দেখা হয়েছে তার জীবনে। জীবনের ধৈর্য্য তার বেশি নয়—তবু সে বোঝে সংসারে তার কোনো জোর নেই। মাতৃহীন সংসারের গৃহিণী ছিল চপলা, ছোট ভাইটিকে সন্তান স্নেহেই পালন করেছে। সামাজিক নিয়মে স্বামীর ঘর করতে গেছে সে। স্থায়ী হয় নি সেই ঘরের স্বপ্ন। বহিরাক্রমণে ভেঙে পড়া

সম্পর্কের দুর্গটি তত সুরক্ষিত ছিল না আসলে, বুঝতে তার সময় লাগে নি। অপরাধ অন্যের হলেও সামাজিক কলঙ্ক গায়ে লাগায়, অপরাধী হতে হয়েছে তাকেই। স্বামী বা পিতা—কারোর আশ্রয়ই না পাওয়ায় তার স্থান হয়েছে উল্টোডিঙির বেশ্যাপাড়ায়। সে আশ্রয় পায় তার শরীরের বিনিময়ে। অন্যের আশ্রয় সে হয়ে উঠতে পারে না। অভিমানী ভাইকে বিদায় দিতে হয় তাকে।

ভাইটি তার নিয়ে যেতেই এসেছিল। গ্রাম থেকে আসা রতন দিদির ঘরে জিনিসের প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার সহজ মনের কোনো কোণেই আশঙ্কার মেঘ জমে নি। একটু জিরিয়ে নিয়েই দিদিকে নিয়ে রওনা হবে—এই খুশিতেই সে মশগুল। দিদির না যাওয়ার কারণ হিসেবে সে ভেবেছে, দিদি তার জিনিসগুলিকে ফেলে যেতে চায় না। সে সরলভাবেই গরুরগাড়ির প্রস্তাব দিয়েছে। দিদি তাতেও রাজি না হওয়ায়—সেও দিদির কাছেই থেকে যেতে চেয়েছে। দিদি থাকতে দিতে চায় নি। তার বদলে রতনের হাতে পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খেতে বলেছে। রতন বুঝেছে দিদি তাকে থাকতে দেবে না। তার বুক ভেঙে গেছে।

বুক ভেঙেছে চপলারও। রতন তাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে আসবে এ তো সে ভাবে নি। সে জানত সমাজ-সংসারে সে ব্রাত্য! ছোট ভাইটার বুকে এখনও যে টান, সে মায়ায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল চপলা। রতন যখন অনেক খুঁজে উল্টোডিঙিতে পৌঁছোয়—"চপলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কষ্ট হয়। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে। দুজনেই খানিকক্ষণ থাকে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। ....উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা গলায় বলে, 'তুই একা এসেছিস!'

রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।"

রতনের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিল না—তার উত্তেজনার শেষ হয়েছে। তার পরম কাঙ্ক্ষিত ধনকে সে পেয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে চপলা এদিক-ওদিক চেয়ে কাকে খুঁজছিল? বাবাকে? স্বামীকে? রতন একা না এসে এদের কারো সঙ্গে আসলে চপলার জীবনের রং বদলে যেতে পারত। কিন্তু তা হলো না। রতনের এই একক আগমন তার অবস্থানের বদল ঘটাতে পারবে না জেনেই ভাইকে এই কলঙ্কিত স্থান থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব বিদায় দিতে চেয়েছে। ভাই বোঝে নি। সে অভিমানে আহত হয়েছে।

রতন যেতে যেতেও ফিরে আসে। ফিরে আসে এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে—"বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি।" এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞায় কাহিনির শেষ হতে পারত। হয় নি। আর সেখানেই আছে শিল্পীর সুবিচারবোধ। গল্পটি শেষ হয় এক অসামান্য বাক্য দিয়ে—"মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়"।

৪

"মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়"—বোঝা যায় এক কবির কলম কথা বলছে—দৃপ্ত, সংযমী, প্রত্যয়ী। নাটকীয়তার হাজারো প্রলোভনকে সামলে যে পথে কাহিনি নিয়ে এগোলেন গল্পকার, তাতে তাঁকে কুর্নিশ জানাতে হয়। বালক রতনের দিদির

খোঁজে কলকাতা আসা, দিদিকে খুঁজতে খুঁজতে উল্টোডিঙি যাওয়া, দিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ—নাটকীয়তার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল সবখানেই। কোনো প্রশ্রয় দেন নি প্রেমেন্দ্র। গল্পটিও একেবারে প্রথম থেকেই কিছুটা শ্লথ গতি। মহানগরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা হুগলি নদীর মতোই শ্লথ। শ্লথ কিন্তু একমুখী। অনামা এক গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে গল্প এসে পৌঁছোয় উল্টোডিঙির বেশ্যাপাড়ায়। এই অনিবার্যমাত্রা গল্পটিতে পথ খুঁজে নিয়েছে।

কথকতার ঢঙে শুরু হয়েছিল গল্পটি—সহজ বিবৃতির পথে। ক্রমশ লেখকের চোখ থেকে রতনের চোখ, বড়দের বাস্তবতা থেকে ছোটোদের বাস্তবতা, প্রাপ্তমনস্কের সমাজ ও ন্যায়বোধ থেকে বালকের সমাজ ও ন্যায়বোধে কাহিনি সরেছে। যেভাবে সরেছে তাতে কাহিনিকারের মুন্‌শিয়ানার প্রমাণ আছে। রতনের সঙ্গে চপলার মিলনদৃশ্যটির অতিস্বাভাবিকতা যে কোনো মুহূর্তেই ক্ষুণ্ণ হতে পারত। বহুদিন অদর্শনের পর ছোট্ট রতনের দিদির বুকে মুখ গুঁজে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকা আসলে কোনো কথা না বলেই অনেক কথা বলা। তেমনি কথা বলে ওঠে চপলার অনুসন্ধিৎসু ব্যাকুল চঞ্চল চোখ—রতনের সঙ্গীর খোঁজ করে। অকারণ বিবৃতি দিয়ে পাঠককে ক্লান্ত করেননি লেখক। চপলার দুর্ভাগ্য বোঝার ক্ষমতা ছিল না রতনের। মাটির বাড়ি যে অত সুন্দর জিনিস দিয়ে সাজানো হতে পারে, দিদির যে অনেক জিনিস আছে, এত জিনিস যে বাড়ি যেতে গেলে দিদির শুধু নৌকোয় উঠলেই হবে না—একটা গরুর গাড়িও লাগবে, এইসব শিশুসুলভ ভাবনার আলস্যেই প্রকৃত ট্র্যাজেডির যন্ত্রণাটা কিছুটা মৃদুতা পেয়ে যায়। নাগরিক নীল নিয়নের মায়াবী আলোয় যেমন ঢাকা পড়ে থাকে বহু অর্থহীন কদর্যতা—তেমনি চপলার গ্লানিময় জীবনও রতনের সারল্যে চাপা পড়তে থাকে।

যাকে আপাতভাবে চাপা দেওয়া হয়—তা তো আসলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। তাই শেষ হয় না রতনের দুর্ভাগ্যেরও। চপলা রতন নয়, সে বোঝে ভাইকে ফেরত পাঠাতে হবে সন্ধ্যের আগেই। এই ফেরত পাঠানোর আয়োজন চলতে থাকে দিদির তরফে। অবুঝ ভাই বোঝে না। দুজনেরই হৃদয়ে ক্ষত তৈরি হয়—রক্ত ঝরে টুপটাপ, অলক্ষ্যে। শেষ পর্যন্ত ফিরতে হয় রতনকে। চপলা দাঁড়িয়ে থাকে একা, স্থির। চলে যেতে দেখে ভাইকে। গল্পটা এখানেও শেষ হতে পারত। শেষ হওয়ার জন্য চমৎকার ফ্রেম তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হয় নি। হয়নি, কারণ রতন আবার ফিরে আসে, তার অবিশ্বাস্য আশ্বাস নিয়ে—আবার আসবে সে বড় হয়ে। দিদিকে নিয়ে যাবে। কারো কথাই সে শুনবে না তখন। কাহিনি এখানেও শেষ হতে পারত। হয় নি। রতনের দ্বিতীয়বার ফিরে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। দিদি দাঁড়িয়ে থাকে স্থির। কাহিনি শেষ হয় অসামান্য ব্যঞ্জনায়—"মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়"। গল্পকার জানেন, পাঠক জানেন, চপলাও জানে—এই সন্ধ্যাই আসলে সত্য। দিন কাটবে, বড় হবে রতন, ক্রমশ তার স্মৃতি হবে ফিকে—সংসার সমাজ তাকে গ্রাস করে নেবে, যেমন মহানগর গ্রাস করেছে তার দিদিকে। রতন বুঝবে দিদির কথা বলতে নেই, ভাবতে নেই—এইভাবেই সত্য হয়ে উঠবে মহানাগরিক গ্রাস। আর তাই এই গল্প চপলার নয়, রতনেরও নয়—এই গল্প আসলে মহানগরের। শুরুতেই লেখক জানিয়েছিলেন—"এ মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত—ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।"

তেলেনাপোতা আবিষ্কার : পুরোনো পাঠের উজান ঠেলে কিছু কথা

অরূপকুমার দাস

১

'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। এতে ' তেলেনাপোতা' আবিষ্কার' ছাড়া আর যে সাতটা গল্প ছিল সেগুলো হল 'স্টোভ', 'জ্বর', 'চিরদিনের ইতিহাস', 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা', 'চুরি', 'পিস্তল' এবং 'পটভূমিকা'। আমাদের 'কারিকুলাম' নির্ভর সাহিত্যচর্চার পরিমণ্ডলে এই পর্যায়ের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' চর্চা ও ব্যাখ্যার শীর্ষে। জনপ্রিয়তায় তার পরই 'স্টোভ'। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটা আবার রাশি রাশি পাঠকের মন টেনে নেয় যে বিশিষ্টতায়, তা সত্যিই অভিনব। এখানে যে সমাজতত্ত্ব আছে, তা প্রত্যক্ষত ধাক্কা দেয় না পাঠককে। ধাক্কাটা আসে পরোক্ষে। যে, ১৯৪৬ সালে বা তার কিছু আগে লেখা গল্পের বর্ণনায় বাংলা ভূখণ্ডের যে গ্রামের দুর্দশালাঞ্ছিত রূপ পড়ছি, তাকে আবার ছুঁয়ে দেখতে চাইলে এবং তার জন্য অনির্দিষ্ট গন্তব্যে বেরিয়ে পড়লে কোথাও না কোথাও পেয়ে যাব আজও প্রধান নগরকেন্দ্র থেকে ৫০-৬০ মাইল বৃত্তাকার পশ্চাদভূমিতে। এর থেকে গ্লানিকর আর কী হতে পারে? এই গ্লানিকর সমাজবাস্তব প্রেমেন্দ্র মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন বিচিত্র আঙ্গিকে; যা প্রায় অতুলনীয় আমাদের সাহিত্যে, এমনকি দেশ-বিদেশের অন্যান্য সাহিত্যেও।

২

পূর্বাচার্যদের মতামতকে প্রদক্ষিণ করেই আমরা প্রবেশ করব নিজেদের নিরীক্ষায়। এই মুহূর্তে হাতের কাছে যাঁদের মতামতগুলিকে তরঙ্গতাড়ন থেকে সরিয়ে এনে দেখা যায় তাঁদের সর্বাগ্রে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। তিনি লেখেন, "গল্পে ক্রিয়ার কালের দিক থেকে নতুন প্রয়োগ ঘটালেন তিনিই 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এ। প্রথম অনুচ্ছেদে অনুমানবাচক ক্রিয়াপদের দুটি একটি প্রয়োগের পরই লেখক সরাসরি ভবিষ্যৎ কালজ্ঞাপক ক্রিয়াকে এই গল্পের ক্ষেত্রে জরুরি করে তুললেন। পাঠক গল্পের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দেখেন যে ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপকক্রিয়া কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণামের নির্দেশক নয়। বরঞ্চ তা যেন শুধুই সম্ভাব্যতার সূচক। এমনটাই হয় এমনটাই হতে পারে—এমনটাই হবে। এখানেও সেই ব্যর্থ বিমুখ পুরুষকারের গল্প। এখানেও দেখা মিলবে এক ভাঙা পোড়ো বাড়িতে পাওয়া যায় এমন এক গা ছমছমে আবহাওয়ার। 'শ্রীহীন জীর্ণতা', 'নগ্ন ধ্বংস মূর্তি', 'সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি', 'প্রেতপুরী', 'ছিন্ন কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি'—এই সবকিছুর পটভূমিতে একটি মেয়ে—যামিনী। গম্ভীর কঠিন তার মুখ; দৃষ্টি তার সুদূর ও করুণ। লেখক তার উপমান হিসাবে আহ্বান করেছেন ধ্বংসপুরীর ছায়াকে। সেই ছায়ার মতো মেয়েটিও বুঝি অবাস্তব—এই ইঙ্গিতে যে ব্যঙ্গ, তার আঘাতেই যামিনী কল্পনায় যে রোম্যান্টিক সৌন্দর্যাভিসার তা ভেঙে গেল। 'গম্ভীর কঠিন যার মুখ